দুলারীবাঈ

বারীন্দ্রনাথ দাশ

কথাকলি
১ পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ : শ্রাবণ ১৩৬৭

প্রকাশক :

প্রকাশচন্দ্র সিংহ

১ পঞ্চানন ঘোষ লেন,

কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :

জিতেন্দ্র নাথ বসু

দি প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া

৩।১ মোহনবাগান লেন

কলিকাতা-৪

প্রচ্ছদ :

পূর্ণজ্যোতি ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :

ফাইন প্রিণ্টার্স প্রাইভেট লিঃ

বাঁধাই

নিউ বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

পরিবেশক :

ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিঃ

২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

দাম : চার টাকা

শ্রীপাহাড়ী সান্যাল

প্রিয়বরেষু

এই উপন্যাসের সমস্ত চরিত্র, চরিত্রের নাম, ঘটনা প্রভৃতি আকস্মিক এবং নিতান্তই কাল্পনিক। কোথাও কোনো সাদৃশ্য সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত।

রচনাকাল

মার্চ-এপ্রিল-মে, ১৯৬০

জানলার কাচের সার্শি ঝনঝন করে উঠলো।

সেণ্ট্র্যাল এভিনিউ দিয়ে একটি ভারী ট্রাক ছুটে যাচ্ছে সারাটা পথ কাঁপিয়ে।

বৌবাজারের এক কানা-গলির ভেতর যে-বাড়ির পেছন দিকের ঘরের জানলা দিয়ে সেণ্ট্র্যাল এভিনিউর খানিকটা দেখা যায়, আর দেখা যায় হাওড়ার পুলের ওপারে খানিকটা ধোঁয়াটে-নীল আকাশ, সে ঘরের এক আধো-অন্ধকার কোণে ফুল-লতা-পাতা-পরী প্রভৃতি নানারকম কাজ করা এক সেকেলে জবরজঙ উঁচু খাটে হাতের বাজুতে মাথা রেখে শুয়েছিলো এক সায়াহ্ন-যৌবনা নারী।

তার ঘুম ভেঙে গেল।

ঘুম ভেঙে যেতে শুনলো বাইরে কাক ডাকছে সামনের বাড়ির ছাতের আলসেতে। চোখ খুলে দেখলো জানলার ওপারের আকাশ ফরসা হয়ে গেছে। সকালবেলার মন্থর ট্রাম ঘড়ঘড়িয়ে চলেছে বৌবাজার স্ট্রীট দিয়ে। রাস্তায় লোক চলাচল শুরু হয়েছে। শোনা যাচ্ছে শেয়ালদার ওদিক থেকে ছুটে-আসা সব্জী-আনাজের ভারীদের কলকোলাহল। পাশের বাড়ির বুড়ি বাড়িউলী খুব জোর আওয়াজ করে কুলকুচো করছে আর কেশে কেশে গলা সাফ করছে। নিচের তলায় চৌবাচ্চার কল ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। একটানা জল পড়ছে। পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে শেয়ালদার ট্রেনের বাঁশি।

এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া এলো খোলা জানলা দিয়ে।

সেই সায়াহ্ন-যৌবনার মনে হোলো এ যেন উনিশশো পঞ্চাশের মন্থর বর্ণবিহীন দিনগুলোর আরেকটির শুরু নয়, এ যেন অনেক অনেক অনেক বছর আগেকার উদ্দাম দিনগুলোর কোনো একটির উন্মুখ প্রত্যাশা।

সে চোখ বুঁজলো। একটু পরেই হয়তো তার পরিচারিকা জান্‌কী ঘরে ঢুকবে এক হাতে চাঁদীর থালাভরা নাশতা, অন্য হাতে বাদাম-পেস্তার শরবতের গেলাস নিয়ে। ঝুনঝুন করে বেজে উঠবে তার পায়ের তোড়া। সে ঘরে ঢুকে গেলাস আর থালা নামিয়ে রাখবে ছোটো জলচৌকির উপর। থালার আপেল আঙুর ডালিম নাসপাতির গন্ধে এদিকে উড়ে আসবে জানলার কাচের সার্শির ওই নীল মাছি। জান্‌কী আস্তে আস্তে এগিয়ে আসবে বিছানার কাছে। তারপর আস্তে আস্তে ডাকবে,—বাঈজী, অনেক বেলা হোলো, এবার ওঠো।

সে আস্তে আস্তে এপাশ ফিরবে। চোখ খুলে অলস চাউনি তুলবে জানলার দিকে। দেখতে পাবে, সোনারং রোদ্দুর আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকছে একটু একটু করে। গা-মোড়া দিয়ে একটু হাই তুলবে। চোখ বুঁজবে।

জান্‌কী বলবে,—নাশতা নিয়ে এসেছি, বাঈজী!

সে আবার চোখ খুলবে। চোখ খুলে দেখবে জান্‌কীর কান-ফুলের নকল পাথর ঝিকমিক করছে সকালবেলার রোদ্দুরে। আবার চোখ বুঁজবে। প্রত্যেকদিন কী উঠতে ইচ্ছে করে এত সকাল সকাল?

ওঠো বাঈজী, অনেক বেলা হয়ে গেছে,—বলবে জান্‌কী।

বেলা হয়ে গেছে, অনেক বেলা। আগের দিনের ক্লান্তি এখনো যায়নি, এত তাড়াতাড়ি রাত ফুরিয়ে আবার আরেকটি দিন। আগের রাত্তিরের আমেজ এখনো ভারী হয়ে আছে দুটো কাজল চোখের পাতায়। তবু সেই চোখ দুটো খুলে সইতে হবে রুক্ষ দিনের নিষ্করুণ আলো। তবু বেলা হয়ে এসেছে,—অনেক বেলা। জান্‌কী এসেছে নাশতা আর শরবত নিয়ে।

আস্তে আস্তে মাথাটা তুলবে বালিশ থেকে, আস্তে আস্তে নেমে আসবে উঁচু খাট থেকে।

তারপর সিঙারের অবকাশে শুনতে পাবে মাইফিল-ঘরে সারেঙ্গি মেলাচ্ছে বুড়ো ওস্তাদ হাসমত আলি। হাতুড়ি দিয়ে তবলার চারদিকে ঠুকছে রাজকিশোরজী। এলোমেলে হারমোনিয়াম বাজিয়ে চলেছে কানাইয়ালাল।

এখন তাকে বাইরে বসে রেওয়াজ করতে হবে ঘণ্টা দুই-তিন। তারপর খাওয়া দাওয়া সেরে দুপুরবেলা টেনে একটা ঘুম। হয়তো বিকেলবেলা ফিটন চড়ে হাওয়া খেয়ে আসবে গড়ের মাঠে।

তারপর,—তারপর রাত্রির প্রথম প্রহরে যখন জানলার ওপারে চাঁদ ঝুলবে শহরের লক্ষ আলোর দ্যুতিতে ফিকে-আঁধার কলকাতার আকাশে, যখন কিছুক্ষণ পরপর একটা দুটো করে ল্যাণ্ডো ফিটনের ঘোড়ার ক্ষুরের দ্রুত ধাবমান সাড়া শোনা যাবে তেতলার বারান্দা থেকে, সরু গলির ছায়াশিহর বাঁকে টিমটিম করবে গ্যাসবাতির ঝিমস্ত নীল আলো, মাইফিল-ঘরে জ্বলে উঠবে ঝাড়-লণ্ঠনের তীব্র রোশনাই। ঘরজোড়া গালচের এককোণে বসে কানাইয়ালালের হারমোনিয়াম আর হাসমত আলির ছুট-তানের জওয়াব দেবে রাজকিশোরজীর তবলা, আর ওপাশের এক হাত পুরু গদির উপর বিমুগ্ধ হয়ে বসে থাকবে সিংদেওজি, আর তার দুপাশে শেঠ বুলাকী-প্রসাদ, লালাদের ছোট তরফের নতুনবাবু শিবশঙ্কর,—তিন অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু। তার গান শুনবে, গান শুনে বিভোর হয়ে যাবে, বিভোর হয়ে আত্মহারা হয়ে যাবে, আত্মহারা হয়ে তারিফ্ করবে অকুণ্ঠিত ভাষায়। তাদের বিনম্র তসলিম জানিয়ে আবার ভাও দিয়ে গাইতে শুরু করবে কলকাতার শ্রেয়সী মুজরাওয়ালী দুলারীবাঈ।

তেরী জুলফকো মুহব্বতকা জন্জীর কহতে-এ-এ হায়
আ-আ-আ-আ-আ-আ
তেরী নজরকো-ও-ও-ও

চোখ-বোঁজা স্মরণের অনেক ওপার থেকে এক মিঠা গজলের

রেশ ভেসে এলো পর্যঙ্কশায়িনীর মনে। আস্তে আস্তে চোখ খুলে দেখলো সামনের দেওয়ালে পুরোনো দিনের সেই মুজরাওয়ালী দুলারীবাঈয়ের তসবির। তখনকার দিনের এক সেরা শিল্পী তার তেলরঙের মায়াজালে ধরে রেখেছে এক গোলাপের পাঁপড়ির প্রভাতী সৌন্দর্যকে।

সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো দুলারীবাঈ। মনে হোলো সেই ছবির উপর যেন ধুলো জমেছে একটুখানি। খাট থেকে উঠে এসে একটি আধময়লা ঝাড়ন দিয়ে ছবির মুখখানি পুঁছে দিলো খুব হাল্কা ভাবে, তারপর ঘুরে গিয়ে ঘরের অন্য কোণে ড্রেসিং-টেবিলের আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালো। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো নিজেকে। একবার নিজের ছবির দিকে তাকালো, তারপর আবার তাকালো নিজের দিকে। হিসেব করলো নিজের ছবি আর নিজের প্রতিবিম্বের মধ্যে বছরগুলোর ব্যবধান। হঠাৎ অস্ফুট আর্তনাদ করে মুখ ঢাকলো দুহাতে।

তারপর আবার আস্তে আস্তে হাত দুটো সরালো।

হাত দুটো সরিয়ে, হতাশ বিস্ময়ে তাকালো, যেমনি করে তাকায় প্রত্যেকদিন সকালে। দেখলো, আয়নার ভেতর থেকে তারই দিকে তাকিয়ে আছে সেই একই দুলারীবাঈ।

কিন্তু তার চোখে নেই দশ বছর আগেকার সেই বিদ্যুৎ-বহ্নি। আজ তার চোখ দুটো অলস, ক্লান্ত, স্মরণ-নিথর। আজ তার চোখের কোণে ভাঁজ পড়ে গেছে। কিন্তু সে একটা দিন ছিলো, যখন ঘুম ভেঙে উঠে এই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হাতদুটো মাথার পেছনে রেখে টান করে দাঁড়ালে প্লাবন জেগে উঠতো শরীর ভরে, চোখ থেকে উরু পর্যন্ত টলটল করতো ভরা-পূর্ণিমার মতো সৌন্দর্যের জোয়ার।

একটু নিঃশ্বাস ফেলে চোখ নামিয়ে নিলো পুরোনো দিনের মুজরাওয়ালী বত্রিশ বছরের দুলারীবাঈ। আস্তে আস্তে গায়ে

চাপালো অন্তর্বাস। ধীরে ধীরে জড়িয়ে নিলো একটি তাঁতের শাড়ি।

তারপর ডাকলো,—"বৃন্দা!"

পুরোনো দিনের সুন্দরী পরিচারিকা জান্‌কী আর নেই। এখন আছে এক পূর্ববঙ্গের ঝি। তারই নাম বৃন্দা।

"যাই দিদি", বৃন্দা উত্তর দিলো। একটু পরে বৃন্দা এসে ঘরে ঢুকলো ট্রে-তে চায়ের সরঞ্জাম সাজিয়ে। আপেল আঙুর নাসপাতি-ভরা থালা আর বাদাম-পেস্তার শরবতের দিন চলে গেছে। হাল আমলের ব্যবস্থা এখন টোস্ট অমলেট আর চায়ের।

"ওসব নিয়ে যা", বললো দুলারীবাঈ, "শুধু চা খাবো, আর কিছু খাবো না।"

"কেন দিদি?"

একটু চুপ করে রইলো দুলারীবাঈ। তারপর আস্তে আস্তে বললো, "মাথাটা বড্ড ধরেছে। বুকেও যেন কিরকম একটু ব্যথা করছে।"

টোস্ট আর অমলেটের ডিশ তুলে নিয়ে বৃন্দা চলে যাচ্ছিলো।

দুলারীবাঈ ডেকে বললো, "চা-টা তুইই আজ তৈরী করে দে। আমি পারছি না। বড্ড থকাওট লাগছে।"

বৃন্দা কাপে চা ঢেলে দুধ-চিনি মেশাতে লাগলো।

আজ আর এত সকালে প্রত্যেকদিনের মতো স্নান করতে ইচ্ছে হোলো না। শুধু মুখ ধুয়ে এসে চা খেতে বসলো দুলারীবাঈ। চা খেয়ে তারপর জানলার কাছে এসে দাঁড়ালো।

রাস্তায় লোকের ভিড় ক্রমশ বেড়ে উঠছে। শুরু হয়ে গেছে বৌবাজার অঞ্চলের প্রত্যেকদিনকার হৈ-চৈ। জানলায় দাঁড়িয়ে দুলারীবাঈ রাস্তার দিকে তাকালো। দেখলো, স্কুলের ঝিয়ের সঙ্গে কয়েকটি মেয়ে পথ দিয়ে হেঁটে চলেছে।

দোতলায় একতলায় শোরগোল। পাশের বাড়িতে জল নিয়ে

ঝগড়া, শালীনতাবিহীন ভাষা। তুলারীবাঈয়ের মনে হোলো মাথাটা যেন আরো বেশী ধরে যাচ্ছে। সেকালে বেশির ভাগ সময় উর্দু ই বলতো সে। এখন উর্দুর জমানা চলে গেছে। বাঙলা বলতে হয়, কিংবা আটপৌরে হিন্দি। উর্দুর সঙ্গে সঙ্গে সেই মিষ্টিমধুর সৌজন্যময় আদবকায়দার দিনও চলে গেছে। এখন মামুলী দৈনন্দিন কাজে শুধু মামুলী চালে কথা শুনতে হয় আর বলতে হয়, মামুলী স্থূলতার রুক্ষতায়। কারো তেমন কিছু গায়ে লাগে না, কিন্তু পুরোনো দিনের আবহাওয়ায় বড়ো হয়েছে তুলারীবাঈ, এখনকার চালচলন তার মোলায়েম চামড়ায় বেঁধে সহস্র আলপিনের মতো। এখন সবাই যেন খুব জোরে হাসে, খুব জোরে কাঁদে, খুব চিৎকার করে গল্প করে, খুব চিৎকার করে ঝগড়া করে। এই চিৎকার চেঁচামেচি আর সয় না। সময় সময় মাথা ধরে যায়। কিন্তু উপায় নেই। তাকে শুনতে হয় সকাল বিকেল সন্ধ্যের এই শোরগোল, চেঁচামেচি, চিৎকার।

একটা সময় ছিলো যখন পুরো তেতলা বাড়িটাই ছিলো তার একলার দখলে। কিন্তু এখন তার সময় ভালো নয়, অতো ভাড়া একলা দেওয়ার ক্ষমতা নেই। একতলা দোতলা এখন এক-এক কামরা করে ভাড়া দিয়ে দিয়েছে। তাইতে পুরো বাড়ির ভাড়াটা উঠে আসে, নিজের তহবিল থেকে কিছু আর বার করতে হয় না। কিছু উপরিও থাকে। শুধু গানের আর রোজগার নেই আগের দিনের মতো, আর সেকালের মতো বিলাসিতা করবার মনও তার নেই।

থেকে থেকে পালাতে ইচ্ছে করে এই পরিবেশ থেকে। কিন্তু পালাবার মতো অবলম্বনও তার কিছু নেই। বরং এই বাড়ির অসংখ্য স্মৃতি তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে এমন ভাবে জড়িয়ে রেখেছে যে জীবনের এই ছোটো গণ্ডির বাইরে, বেরোনোর আর কোনো উপায়ও নেই।

তাই সে ফাঁক পেলে জানলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেখে পথের লোকজন। সেখানে কোনো দেওয়াল নেই, কোনো স্থাবরতা নেই। যতো দূর যায় পথের পরে শুধু পথ, অন্য অনেক পথ এসে পড়েছে এই পথে, এই পথ অন্য পথে মিলিয়ে গেছে। সেখানে শুধু নদীর মতো প্রবাহ সমস্তক্ষণ, সেখানে শুধু গতি, সেই দুরন্তগতি প্রবাহ নদীর জলে কোনোরকম আবিলতা হতে দেয় না।

আজও দুলারীবাঈ জানলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো পথের লোকজন। দেখলো পথ চলতি ছেলেমেয়েদের, যারা ঝিয়ের সঙ্গে স্কুলে যাচ্ছে। তাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো দুলারীবাঈ, তারপর তাকালো আকাশের দিকে। দেখলো, সেখানে উড়ে যাচ্ছে হাল্কা তুলোটে মেঘ-রং বকের পাঁতি। আস্তে আস্তে মনে পড়লো জীবনের কোনো এক স্নিগ্ধ প্রভাতে সেও স্কুলে যেতো।

তবে বেশীদিন যাওয়া হয়নি।

কিছুদিনের মধ্যেই তাকে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করতে হয়েছিলো। —আজো পরিষ্কার মনে পড়ে সেই দিনগুলোর কথা।

একুশ বছর আগেকার কথা। বাচ্চা বয়েস তখন। সবে এগারোতে পড়েছে।

সকালবেলা একগ্লাস দুধ খেয়ে সে এমনিতরো দাঁড়িয়েছিলো এই জানলারই পাশে। আকাশে সেদিনও উড়ে যাচ্ছিলো বকের পাঁতি। আর বড়ো রাস্তা দিয়ে স্কুলে যাচ্ছিলো কয়েকটি মেয়ে।

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো সে। তারপর কি মনে হোলো, দৌড়ে ছুটে গেল তার মায়ের ঘরে।

তার মায়ের সেদিন ঘুম ভেঙেছে একটু আগে। হাতমুখ ধুয়ে ঘাগরার উপর একটা ওড়না জড়িয়ে নাশতায় বসেছে। আগের

দিন অনেক রাত জেগে ক্লান্ত চোখ। কিন্তু তাড়াতাড়ি উঠে না পড়ে উপায় নেই। ওস্তাদ এসেছে, সারেঙ্গিয়া এসেছে, তবলচি এসেছে। রেওয়াজ করতে হবে, কারণ সেদিন রাত্তিরেও মাইফিল আছে পলাশতলার রায়চৌধুরীদের বাড়ি।

জীবনের সেই একই ধারা চলে আসছে নানী-মায়ের আর নানীমায়েরও নানীর আমল থেকে। তার নানী-মা ছিলো মুজরাওয়ালী নার্গিসবাঈ, আর তার মা ফিরোজাবাঈ।

তখন ফিরোজাবাঈ সবে একটি খেজুর মুখে তুলেছে। দুলারী ঘরে ঢুকে মায়ের কোল ঘেঁষে দাঁড়ালো। তার আনার-রং মুখ-খানি তুলে তাকালো মায়ের মুখের দিকে।

ফিরোজাবাঈও মেয়ের মুখের দিকে তাকালো।

সেই তাকানোয় অশান্ত জীবনের নিষ্করুণ চপলতা মুছে গেল ফিরোজাবাঈএর চোখ থেকে। ভেসে উঠলো মমতাময়ী জননীর চিরন্তন স্নেহ।

জিজ্ঞেস করলো, "কি হোলো রে দুলারী, আজ এত সকাল-সকাল আমার কাছে ছুটে এলি কেন? কি চাই বল।"

"যা চাই দেবে?" দুলারী জিজ্ঞেস করলো।

"আগে বল তো, তারপর দেখা যাবে", ফিরোজাবাঈ বললো মেয়ের মুখে একটি আঙুর তুলে দিয়ে।

দুলারী ভাবছিলো, মা শুনলে রাগ করবে না তো! একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলো, "বলবো?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, বল।"

"আমি প্রত্যেকদিন জানলায় দাঁড়িয়ে দেখি মেয়েরা স্কুলে যায়।"

দুলারীর কথা শুনে ফিরোজাবাঈ একটু হাসলো।

সাহস পেয়ে দুলারী বললো, "মা, আমিও স্কুলে যাবো।"

ফিরোজাবাঈ তাকিয়ে রইলো দুলারীর দিকে।

দুলারীর মনে হোলো, কিরকম ধারা যেন চাউনি তার মায়ের

চোখে। তার বুক ঢিপঢিপ করতে লাগলো। দেখলো, তার মা তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি যেন ভাবছে।

ফিরোজাবাঈ অনেকক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে থেকে তারপর আস্তে আস্তে মাথা নাড়লো।

"কেন মা? অনেক মেয়ে তো যায়।"

ফিরোজাবাঈ মেয়ের মুখে একটি কমলার কোয়া তুলে দিয়ে আবার ঘাড় নাড়লো।

"হ্যাঁ মা, যায়। রাস্তা দিয়ে ঝিয়ের সঙ্গে প্রত্যেকদিন যায়। আমি ওই ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে দেখতে পাই।"

"না, দুলারী, সব মেয়ে স্কুলে যায় না।"

দুলারী একটু জেদী মেয়ে। ঠোঁট ফুলিয়ে বললো, "কেন মা? সব মেয়ে না যাক, আমি যাবো।"

"না।"

দুলারী ঘরের মেঝেতে দুম করে পা ঠুকে বললো, "হ্যাঁ মা, যাবো।"

ফিরোজাবাঈ কোনো উত্তর দিলো না। বিষণ্ণ গম্ভীর হয়ে গেল তার মুখ। চুপচাপ কমলার কোয়া ছাড়িয়ে খেতে লাগলো।

দুলারী কিছুক্ষণ চুপচাপ অপেক্ষা করলো। তারপর মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কোনো উত্তর না পেয়ে আস্তে আস্তে সরে গেল সেখান থেকে।

সারাদিন তার মন খারাপ হয়ে রইলো। খাওয়া দাওয়ার পর চুপ করে শুয়ে রইলো। পুতুল নিয়ে খেললো না, ঝিয়ের সঙ্গে ঝগড়া করলো না, এঘর ওঘর দাপাদাপি করে বেড়ালো না।

সেদিন এমনি এমনি চুপচাপ কেটে গেল।

তার পরদিনও সকালে দুলারী গিয়ে ফিরোজাবাঈকে বললো, "মা, আমি স্কুলে যাবো।"

ফিরোজাবাঈ হাসলো। ঝি-কে ডেকে বললো, "দুলারীর দুধটা এখানে পাঠিয়ে দে।"

দুলারী গাল ফুলিয়ে বললো, "আমি দুধ খাবো না।"

ফিরোজাবাঈ দুলারীকে পাশে বসিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে নিজের হাতে গেলাস ধরে সেধে আদর করে দুধ খাওয়ালো।

তারপর বললো, "তোর জন্যে একটি নতুন চেন গড়াতে দিয়েছি সাহুকারকে। তাতে একটি বড়ো চুনির লকেট থাকবে। খুব সুন্দর দেখাবে, না ?"

দুলারী বললো, "আমি চেন চাই না, চুনির লকেট চাই না। আমি স্কুলে যাবো অন্য মেয়েদের মতো।"

সেদিন দুপুরবেলা ফিরোজাবাঈ দেখলো দুলারী বারান্দায় বসে খেলছে। একপাশে একটি চেয়ার। তার উপর একটি বেত। সামনে নিচে মেঝের উপর বই খাতা নিয়ে দুলারী বসে। তার পাশে, পেছনে, সারি সারি চার পাঁচটা পুতুল। তাদের সামনেও খাতা আর বই।

মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দুলারী একগাল হেসে বললো, "আমি খেলছি—।"

"কী খেলছিস," হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো ফিরোজাবাঈ।

"স্কুল-স্কুল খেলা," দুলারী অন্য পুতুলদের দেখিয়ে বললো, "এরা মা আমার সঙ্গে পড়ে।"

"তোর মাস্টার কোথায় ?"

"এখনো আসেনি। এক্ষুনি এসে পড়বে।"

দুলারী দেখলো কি রকম একটু অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে আছে তার মা ফিরোজাবাঈ।

সেদিন বিকেলবেলা ঝিয়ের সঙ্গে ছাতে বেড়িয়ে যখন নিচে নামলো, ফিরোজাবাঈ তাকে ডেকে পাঠালো বাইরের ঘরে।

তার ডাক পড়েছে শুনে দুলারী একটু অবাক হোলো, কারণ

সন্ধ্যের পর তার বাইরের ঘরের দিকে যাওয়া মানা। সে থাকে পেছনদিকের একটি ছোটো ঘরে, তার ঝি সুখিয়ার সঙ্গে। তাকে তাড়াতাড়ি খাইয়ে দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে অনেক রাতে ঘুম ভেঙে যায় কখনো কখনো। ঘুম ভেঙে শোনে যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে তার মায়ের গলা। ঠুমরি গাইছে ফিরোজাবাঈ। সঙ্গে তবলা চলছে পাল্লা দিয়ে। আর করুণ সুরের প্রবাহ উঠছে সারেঙ্গিতে।

বেশীক্ষণ শোনা হয় না। রাস্তা দিয়ে মালাকর বেলফুলের মালা হেঁকে যায়। তার ডাক ভেসে ভেসে মিলিয়ে যায় রাস্তার মোড়ে। ততক্ষণে আবার ঘুমিয়ে পড়ে দুলারী।

কোনো কোনো এক সন্ধ্যেবেলা দেখতে পায় ঝকঝকে পাল্কি-গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে সামনের দরজায়। জরি-ঝলমলো দামী বেনারসী শাড়ি পরে জড়োয়া গয়নার বাহার ছড়িয়ে ফিরোজাবাঈ গাড়িতে গিয়ে ওঠে। সঙ্গে তার দুহার। খিদমতগার নজিবুল্লা উঠে পড়ে কোচোয়ানের পাশে। পেছনে আরেকটি গাড়িতে উঠে বসে তবলিয়া, সারেঙ্গিয়া আর হারমোনিয়াম-বাদক। পানের দোকানের সামনে ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি পরা কোনো এক কাপ্তেন বাবু রঙিন রুমাল বার করে মুখ পুঁছতে পুঁছতে ঔৎসুক্যভরে তাকিয়ে দেখে। হয়তো পানওয়ালাকে জিজ্ঞেস করে,—এ কে? নাম শুনে আরো কৌতুহলের সঙ্গে তাকিয়ে দেখে।

তেতলার বারান্দায় চিকের আড়াল থেকে দুলারী তাকিয়ে থাকে।

যখন আরো ছোটো ছিলো, সুখিয়াকে জিজ্ঞেস করতো, "মা কোথায় গেছে?"

"বীড়া-য় গেছে ছোটি বাঈজান্", উত্তর দিতো সুখিয়া। বাঈজীদের পরিভাষায় মুজরা করতে যাওয়াকে বলে "বীড়া-মে জানা।"

দুলারী ঠিক বুঝতো না। ভাবতো কোনো জায়গা-টায়গা হবে।

তবে এখন একটু বড়ো হয়েছে। এখন আর জিজ্ঞেস করে না। শুধু চুপ করে তাকিয়ে থাকে।

রাস্তা দিয়ে কুলপীওয়ালা হেঁকে যায়। রাগ হয় তুলারীর। কুলপীওয়ালা এমন সময় আসে যখন মা ঠিক দরজার সামনে। আরেকটু পরে এলে কী এমন ক্ষতি হয় ওর ?

অন্যদিকে কোথাও হয়তো একটি ফিটনগাড়ি এসে থামে। হাসতে হাসতে দু-চারজন বাবু নামে সেখান থেকে। রঙিন গেঞ্জি আর আধময়লা লুঙ্গি পরা কোনো একজন লোক আস্তে আস্তে তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। ফিসফিস করে কি যেন বলে। অত্যন্ত আগ্রহভরে তার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে ফিটন গাড়ির বাবুরা।

আর তাদের সবাইকে অবহেলা করে তাদের গা ঘেঁষে বেরিয়ে চলে যায় ফিরোজাবাঈয়ের পাল্কি-গাড়ি।

থেমে যায় ওদের আলোচনা। ওরা তাকিয়ে দেখে।

গলির বাঁকে মিলিয়ে যায় সেই পাল্কিগাড়ি। ওরা সেই আধময়লা লুঙ্গি পরা লোকটির পেছন পেছন উঠতে শুরু করে ওধারের তেতলাবাড়ির অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে। দোতলার বারান্দার চিকের আড়ালে দেখা যায় তিন-চারটে মুখ। চিকের পেছনে ঘরের ভেতর খুব ম্লান একটি ইলেকট্রিকের বালব্ জ্বলে।

তুলারী আস্তে আস্তে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ে। ফিরোজাবাঈ চলে যাওয়ার পর বড্ড নিঃসঙ্গ মনে হয় নিজেকে। চুপচাপ শুয়ে পড়ে নিজের বিছানায়। অন্ধকারের আবরণ ভেদ করে আধো-ঘুম আধো-জাগা শ্রবণে ভেসে আসে লাস্য-ললিত হাসির গিটকিরি, আশপাশের বাড়ির নগরবিলাসিনীদের আবছায়া কুঠরির অন্তরাল থেকে। তারপর কখন যেন তুলারীর ঘুম পেয়ে যায়।

সকালবেলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে এধার-ওধারের বাড়ির বারান্দার চিকের আড়ালে রোদ পোয়াচ্ছে দেরী করে ঘুম-

ভাঙা নানা বয়েসের নানা গঠনের চোখে-কালি-পড়া বিস্রস্তবসনা। ওদের সঙ্গে তুলারীর চেনাজানা নেই। তাদের সঙ্গে কথা বলাও মানা। ওরাও খানিকটা সম্ভ্রম খানিকটা কৌতূহল ভরে তাকিয়ে দেখে ফিরোজাবাঈয়ের রূপসী মেয়ে তুলারীর দিকে। এ অঞ্চলে ফিরোজাবাঈয়ের সম্মান রাজরানীর মতো। তার মেয়েকেও রাজ-কন্যার মতো সমীহ করে সবাই।

ওদের কারো সঙ্গে কথা বলা মানা। তার সমবয়েসীদের সঙ্গে খেলাধুলো করা মানা। সন্ধ্যের পর বাইরের ঘরের দিকে যাওয়া মানা। শুধু মানা, মানা আর মানা। হাঁফিয়ে ওঠে তুলারীর মন। তার একমাত্র সঙ্গী তার ঝি সুখিয়া। ইদানিং তাকেও সব সময় পাওয়া যায় না। মাস তিনেক হোলো তুলারীর আরেকটি বোন হয়েছে, সুখিয়া ব্যস্ত থাকে তাকে নিয়ে।

তাই সেদিন সন্ধ্যেবেলা নজিবুল্লা যখন এসে বললো বাইরের ঘরে ফিরোজাবাঈ তুলারীকে ডাকছে, সে একটু অবাক হোলো।

"ডাকছে? কেন?" জিজ্ঞেস করলো তুলারী।

"জানিনা। এক্ষনি যেতে বলছে। ত্রিবেদী সাহেব বসে আছেন সেখানে।"

"ত্রিবেদী সাহেব কে?"

নজিবুল্লা আর সুখিয়া তুজন তুজনের দিকে তাকালো। একটা চাপা হাসি খেলে গেল ওদের চোখে। তুলারী কিছুই বুঝতে পারলো না।

সুখিয়া তার চুলটা আঁচড়ে দিয়ে তুটো বিনুনী করে দিলো। পরিয়ে দিলো একটি ভালো সিল্কের ফ্রক। মুখে একটু পাউডার মাখিয়ে দিলো।

তারপর বললো, "ও ঘরে গিয়ে প্রথমেই কিন্তু ত্রিবেদীজী'র পা ছোঁবে।"

"কেন," জিজ্ঞেস করলো তুলারী।

"ওরকম ছুঁতে হয়," মুখ টিপে হেসে সুখিয়া বললো।

নজিবুল্লার পেছন পেছন বাইরের ঘরে এসে তুলারী দেখলো ফিরোজাবাঈয়ের কাছে বসে আছে খুব সম্ভ্রান্ত দেখতে একজন বয়স্ক সুপুরুষ। তুলারীর একটু একটু লজ্জা করতে লাগলো।

ত্রিবেদীজীর খুব প্রসন্ন মুখ। তুলারীকে দেখে ঝলমল করে উঠলো মুখখানি। কাছে ডাকলো তুলারীকে। তুলারী কাছে যেতে তাকে ধরে একেবারে কোলে বসালো, আদর করে মাথায় হাত দিয়ে বললো, "কতো বড়ো হয়ে গেছে মেয়েটি!"

তুলারীর একটু একটু মনে পড়লো এই ভদ্রলোককে যেন আগেও দেখেছে মাঝে মাঝে। তবে তখন তার বয়েস আরো অনেক কম। পরিষ্কার মনে নেই। শুধু এটুকু মনে আছে যে ত্রিবেদীজী যখনই আসতো তুলারীকে নিয়ে যাওয়া হোতো তার কাছে। সেও তার জন্যে নিয়ে আসতো কিছু না কিছু, কখনো একটা পুতুল বা খেলনা, নয়তো বা একটি সিল্কের জামা, কখনো বা ছোটোখাটো একটা গয়না। খুব ভালো লাগতো ত্রিবেদীজী'কে কিন্তু এত রাশভারী যে ভয়-ভয়ও করতো একটুখানি।

"আমায় মনে আছে তুলারী?"

তুলারী মাথা নাড়লো।

"ওর কি করে মনে থাকবে," বললো ফিরোজাবাঈ, "আপনি মাঝখানে তিনচার বছর বেশী আসেন নি।"

"একেবারে ভুলে যায়নি তুলারী। একটু একটু মনে আছে। তাই না তুলারী?"

হ্যাঁ, একটু একটু মনে আছে—তুলারী ঘাড় নাড়লো।

ফিরোজাবাঈ আর ত্রিবেদীজী তুজনেই হাসলো।

"রক্তের টান আছে," তুলারী শুনলো ত্রিবেদীজী বলছে, "একেবারে ভুলে যাওয়া কি সম্ভব?"

রক্তের টান কথাটা তুলারী বুঝলো না। শুধু কিরকম যেন

মনে হোলো যে এ লোকটি অন্যান্য অনেকের চেয়ে অনেক বেশী আপন। এতটা আপন যে ও এলে তুলারী'কে সন্ধ্যের পর বাইরের ঘরে নিয়ে আসতে কোনো মানা থাকে না।

তুলারী আপনা আপনি কিরকম যেন একটা টান অনুভব করলো ত্রিবেদীজী'র জন্যে।

খানিকক্ষণ সাধারণ আলোচনা করলো ফিরোজাবাঈ আর ত্রিবেদীজী।

তারপর হঠাৎ ফিরোজাবাঈ বললো, "তুলারী বলছে ও স্কুলে যাবে।"

ত্রিবেদীজী তাকালো তুলারীর দিকে। "স্কুলে যাবে?" বলে একটু চুপ করে তাকিয়ে রইলো হাস্যস্ফুরিত মুখে। তারপর বললো, "বেশ তো যাক না।"

তুলারী হঠাৎ মনে মনে খুব খুশি হয়ে উঠলো।

"ভর্তি করিয়ে দেবে কে?" ফিরোজাবাঈ আস্তে আস্তে বললো, "আমরা গেলে তো হবে না।"

ত্রিবেদীজী একটু ভাবলো। তারপর বললো, "আমিই নিয়ে যাবো।"

তুলারীর মন খুশিতে উপচে উঠলো। একটা নতুন ধরনের স্নেহ আর মমতা বোধ করলো সে। ইচ্ছে হোলো সারা রাত ত্রিবেদীজীর কোলে বসে থাকে।

কিন্তু বেশীক্ষণ বসতে পারলো না। একসময় ফিরোজাবাঈ ডাকলো নজিবুল্লাকে। বললো, "একে ভেতরে নিয়ে যাও। ওর ঘুম পাচ্ছে।"

"আমার একটুও ঘুম পাচ্ছে না," বলে উঠলো তুলারী।

ত্রিবেদীজী হেসে তাকে বুকে চেপে ধরলো। বললো, "যেতে ইচ্ছে করছে না বুঝি? আচ্ছা, বসে থাকো আমার কাছে।"

"না, না, ওকে যেতে দাও," ফিরোজাবাঈ বললো, "ওকে আমি বেশীক্ষণ জেগে থাকতে দিই না। ওর একটুতেই শরীর খারাপ হয়।—যাও, তুলারী, এখন গিয়ে শুয়ে পড়ো।"

"কিন্তু আমার যে ঘুম পাচ্ছে না!"

"বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেই ঘুম পাবে। তোমার স্কুলে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেল। আর কি? এবার যাও। তুলারী খুব ভালো মেয়ে। তুলারী আমার কথা শোনে। যাও।"

নিরুপায় তুলারী নজিবুল্লার পেছন পেছন আবার চলে গেল বাড়ির ভিতর।

নিজের ঘরে ফিরে এসে সুখিয়াকে জিজ্ঞেস করলো, "ওই ত্রিবেদীজী কে?"

"আছেন এক সজ্জন," উত্তর দিলো সুখিয়া, "কেন তুমি চিনতে পারো নি, না কি?"

তুলারী কিছুই বুঝলো না, না বুঝেই ঘাড় নেড়ে উত্তর দিলো যে, হ্যাঁ, চিনতে পেরেছে।

ও যে না বুঝেই উত্তর দিয়েছে সেটা বুঝতে পারলো সুখিয়া। সে খিল খিল করে হেসে উঠলো। হেসে তুলারীর গাল দুটো টিপে দিলো। তারপর চুলের রিবনগুলো খুলে দিয়ে, জামাটা খুলে শুধু একটি পেনী পরিয়ে তাকে শুইয়ে দিলো।

তুলারী শুয়ে পড়লো চোখ বুজে। কিছুক্ষণ পর সুখিয়া ভাবলো, ওর হয়তো ঘুম পেয়ে গেছে। পাশের ঘরে কেঁদে উঠলো তুলারীর বাচ্চা বোন। সুখিয়া আস্তে আস্তে উঠে চলে গেল।

তখন তুলারী চোখ খুললো! চোখ পিটপিট করে অন্ধকারে চারদিকে তাকালো। তারপর কান পেতে শুনলো। কিছুই শুনতে না পেয়ে একটু অবাক হোলো। এ সময় ফিরোজাবাঈ বাড়ি থাকলে তার গান শোনা যায়।

হঠাৎ তুলারী উঠে পড়লো বিছানা ছেড়ে। যা কোনোদিন

করেনি, তাই করলো। ঘর থেকে বেরিয়ে পা টিপে টিপে এগিয়ে চললো বাইরের ঘরের দিকে।

একটি বারান্দা পেরিয়ে আরেকটি ঘর, সে ঘরের ভিতর দিয়ে হেঁটে গিয়ে দরজা খুলে বাইরে বেরোলে একটি প্যাসেজ। সেটি বাঁয়ে গিয়ে তারপর হঠাৎ সমকোণে ঘুরে গেছে। সেই সমকোণের কাছে গিয়ে দেওয়ালের আড়াল থেকে তুলারী উঁকি মারলো। দেখলো প্যাসেজের শেষ প্রান্তে নজিবুল্লা মাটিতে বসে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ঝিমোচ্ছে।

পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল তুলারী। চলে এলো বাইরের ঘরের ভেজানো দরজার কাছে।

কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না ভেতর থেকে। তুলারী দরজা একটুখানি ঠেলে উঁকি মারলো।

দেখলো ফিরোজাবাঈ ত্রিবেদীজীর কাঁধে মাথা রেখে বসে আছে, ঠিক যেমনি করে তুলারী মায়ের কাঁধে মাথা রাখে একটুখানি আদর পেতে ইচ্ছে হলে। ত্রিবেদীজী তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে আস্তে আস্তে।

হঠাৎ কি রকম যেন একটা অদ্ভুত অনুভূতি এলো তুলারীর মনে। একটা আশ্চর্য দুর্বোধ্য রাগ হোলো মায়ের উপর।

যেমনি এসেছিলো, তেমনি পা টিপে টিপে নিজের ঘরে ফিরে এলো তুলারী। বিছানায় শুয়ে পড়তে বুক ঠেলে কান্না পেলো। মনে হোলো, সংসারে কেউ তাকে ভালোবাসে না, ফিরোজাবাঈ নয়, সুখিয়া নয়, তার তিন মাসের বাচ্চা বোনটি নয়, এমন কি ত্রিবেদীজীও নয়। ভাবলো,—আমি যখন আরেকটু বড়ো হবো, এখানে থাকবো না, পালিয়ে যাবো এখান থেকে। এখনই পালিয়ে যাওয়া যেতো, কিন্তু এখন যে বয়েস কম, বাইরে বেরোলে রাস্তা হারিয়ে ফেলবে। বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে হলে আর ফিরতে পারবে না।

তার পরদিন এক সময় সুখিয়াকে জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা সুখিয়া, ত্রিবেদীজী আমার কে হয়?"

সুখিয়া মুখ টিপে হেসে উত্তর দিলো, "আমি জানি না, তোমার মা-কে জিজ্ঞেস করো।"

দুলারী বুঝলো যে সুখিয়া ইচ্ছে করলে বলতে পারে, কিন্তু বলতে চাইছে না। তার আত্মসম্ভ্রম খুব। একবার জিজ্ঞেস করে কোনো উত্তর না পেয়ে আর দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলো না।

অনেকদিন পরে একদিন শুনেছিলো ওই ত্রিবেদীজী তার বাবা। উত্তরপ্রদেশ না কোথাকার যেন ধনী তালুকদার, ঠাকুরদার রাজা খেতাব ছিলো। কিন্তু সে কথা যখন জানলো তখন আর তার সঙ্গে দেখা হয় না। তদ্দিনে ফিরোজাবাঈ অসুস্থ হয়ে বিছানা নিয়েছে, দুলারী গ্রহণ করেছে মায়ের পেশা, আর ত্রিবেদীর সঙ্গেও ফিরোজাবাঈয়ের কোনো যোগাযোগ নেই।

মাঝে মাঝে মনে পড়তো তার কথা। একটা বিষাদ অনুভব করতো মনে মনে। মনে পড়তো, ছেলেবেলায় তার স্বভাব-অভিজাত চালচলন দেখে কেন সুখিয়া মাঝে মাঝে নজিবুল্লাকে বলতো,—এরকম তো হবেই। দুলারীবিবির শরীরে যে খানদানী রক্ত বইছে।

শরীরে খানদানী রক্ত বইছে—একথা জীবনে কোনোদিনই ভুলতে পারলো না দুলারী। তাই মনে মনে চিরকাল সবার থেকে একটু আলাদা হয়ে রইলো, আলাদা হয়ে মনের দিক থেকে নিঃসঙ্গ হয়ে গেল।

স্কুলে যেতে আরম্ভ করলো এগারো বছরের বাচ্চা মেয়ে দুলারী।

কয়েকদিনের মধ্যেই তার অনেক বন্ধু। কি তাদের নাম, আজ আর পরিষ্কার মনে নেই—সরস্বতী, গঙ্গা, রাজিন্দার, কুন্তী, আরো কত কে। বড়বাজার অঞ্চলের হিন্দী-ভাষী মেয়েদের স্কুল।

তুলারী তখনো বাংলা জানতো না। ওদেরটা ছিলো বেনারসের খানদানী বাঈজীর ঘরানা। বাড়িতে তখনো একালের মতো বাংলা বলার রেওয়াজ হয়নি। তাই তাকে দেওয়া হয়েছিলো হিন্দী স্কুলে। সেখানে আসতো বড়বাজারের বড়ো বড়ো ঘরের মেয়েরা,—গুজরাতী, রাজস্থানী, পাঞ্জাবী, উত্তরপ্রদেশীয়। তাদের মধ্যে দু-একজনের বাড়িও সে কয়েকবার গিয়েছিলো।

সব চেয়ে বেশী ভাব হোলো কুন্তীর সঙ্গে। কুন্তী বসতো তারই পাশে। প্রত্যেকদিন দুপুরবেলা দুজনে দুজনার টিফিন ভাগাভাগি করে খেতো। এ ওর খাতা থেকে অঙ্ক টুকতো, ও প্রশ্নের উত্তর না পারলে এ ওর কানেকানে ফিসফিস করে বলে দিতো।

একদিন তুলারী হঠাৎ দেখে ক্লাসের মেয়েরা বড্ড গম্ভীর। কেউ তার সঙ্গে কথা বলছে না।

তুলারী বুঝতে পারলো না, কেউ কথা বলছে না কেন। যার সঙ্গে কথা বলতে যায় সেই মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

টীচারও সেদিন তুলারীকে কোনো পড়া জিজ্ঞেস করলো না। ক্লাসের সব মেয়েদের রীডিং পড়তে দিলো, তুলারীকে কিছু বললো না। অঙ্কের ক্লাসে অঙ্কের টীচার সব মেয়েদের এক একজন করে কাছে ডেকে খাতা দেখলো, কিন্তু তুলারীকে ডাকলো না।

সবারই একটা উদ্ধত দূর-দূর ভাব। শুধু কুন্তী খুব বিষণ্ণ। তাকে একফাঁকে জিজ্ঞেস করলো তুলারী, "কী হয়েছে, তোমরা কেউ আমার সঙ্গে কথা বলছো না কেন?"

কুন্তী চারদিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি উত্তর দিলো, "তোমার সঙ্গে ভাই মিশতে পারবো না। মা মানা করে দিয়েছে, 'বহন্‌জী'রাও মানা করে দিয়েছে।"

"কেন?"

কুন্তী এ প্রশ্নের উত্তর দিলো না। ছলছল চোখ নামিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলো।

দুপুরবেলা ডেকে পাঠালো স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী, যাকে মেয়েরা ডাকতো বড়ী-বহন্‌জী।

ডেকে জিজ্ঞেস করলো, "দুলারী, তোমার মায়ের নাম কি ?"

মায়ের নাম বলার মধ্যে যে কোনো অপরাধ আছে, সে জ্ঞান তখনো দুলারীর হয়নি। তবু কি রকম যেন একটু ভয় পেলো সে। কিছু বললো না। চুপ করে রইলো।

টেবিলের অন্য পাশে বসেছিলো এক হৃষ্টপুষ্ট ভদ্রলোক। মাথায় গান্ধী টুপি, পরনে খদ্দরের ধুতি-কুর্তা। তাকে দুলারী জানতো। কয়েকবার স্কুলে দেখেছে। মেয়েদের কাছে শুনেছিলো সে স্কুলের সেক্রেটারি, বিখ্যাত সমাজ-শুধারক ওংকারনাথজী।

এবার সে লোকটি প্রশ্ন করতে শুরু করলো।

জিজ্ঞেস করলো, "ফিরোজাবাঈ কি তোমার মা ?"

দুলারী আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়লো।

"তুমি বাঈজীর মেয়ে ?"

দুলারী আবার ঘাড় নাড়লো।

ওকে আর কোনো কথা জিজ্ঞেস করলো না ওংকারনাথজী। বড়ী-বহন্‌জীর দিকে ফিরে বললো, "ওকে স্কুলে ভর্তি করার আগে ভালো করে সব খোঁজখবর নেওয়া উচিত ছিলো।"

"কি করবো বলুন", বড়ী-বহন্‌জী উত্তর দিলো, "এ্যাডমিশানের ফর্মে তো শুধু বাবার নাম লিখতে হয়। সেখানে ত্রিবেদী নামে এক ভদ্রলোকের নাম আছে।"

ওংকারনাথ হাসলো। বললো, "হ্যাঁ, ত্রিবেদীজীকে আমি জানি। পয়সাওয়ালা লোক, ওর নানারকম খামখেয়াল আছে। —যাই হোক, বাঈজীর মেয়ে হলে যে লেখাপড়া শিখবার অধিকার নেই, একথা আমি মনে করি না। কিন্তু কি করবো ? অন্য মেয়েদের অভিভাবকেরা যখন জানতে পেরে গেছে আর আপত্তিও জানাচ্ছে, তখন এই মেয়েটিকে বলে দেওয়াই ভালো ও যেন স্কুলে আর না

আসে।” তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লো একটুখানি, বললো, “এটা খুবই দুঃখের কথা যে আমাদের দেশের লোকেরা এখনো বড্ডো রক্ষণশীল। শিক্ষালাভ করবার অধিকার যে সবার আছে, একথা বুঝবার উদারতা কারো নেই। এতে সায় দেওয়া আমার প্রিন্সিপল্এ বাধছে, কিন্তু কি আর করি, দশজনকে নিয়ে আমার স্কুল চালাতে হয়, দশজন আমার বিরুদ্ধে গেলে আমার স্কুল বন্ধ হয়ে যাবে।”

ওংকারনাথ ডান হাত তুলে দুলারীর মাথায় রাখলো। খুব সৌম্য মুখ করে, আস্তে আস্তে বললো, “তুমি আফসোস কোরো না বেটী, আমি আশীর্বাদ করছি, তুমি সুখী হবে।”

দুলারী ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো, তারপর গটগট করে বেরিয়ে চলে গেল সেখান থেকে।

বছর সাত আট পরে সেই ওংকারনাথজীর সঙ্গে আবার একদিন দেখা হয়েছিলো।

দুলারী তখন দুলারীবাঈ—কলকাতার নামকরা বাঈজী। তার বাড়িতে মুজরা শুনতে এসেছিলো ওংকারনাথজী।

সে দুলারীকে চিনতে পারেনি। কিন্তু দুলারী চিনতে পেরেছিলো।

তার গান শেষ হতে তার খিদমতগার নসরুদ্দীন যখন ওংকারনাথজীর সামনে রূপোর তবক মোড়া পানের তসতরি নিয়ে দাঁড়ালো, ওংকারনাথ একটি একশো টাকার নোট রেখেছিলো একপাশে।

কিন্তু সে-টাকা দুলারী ফিরিয়ে দিলো, বললো, “আপনার কাছ থেকে তো টাকা নিতে পারি না শুধারক-সাহাব।”

ওংকারনাথজী অবাক। জিজ্ঞেস করলো, “কেন?”

তুলারীবাঈ হাসলো। আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, "আমায় চিনতে পারেন?"

ওংকারনাথ ভুরু কুঁচকে তাকালো। বললো, "তোমায় কি আগে কোথাও দেখেছি?"

"হ্যাঁ, দেখেছেন", তুলারী উত্তর দিলো, "আমার তখন এগারো বছর বয়েস। ফ্রক পরতাম।"

"কোথায় দেখেছি?"

"আপনার স্কুলে।"

"আমার স্কুলে?"

"হ্যাঁ। মনে পড়ছে না?"

"কি করে মনে পড়বে", ওংকারনাথ রাশভারী গলায় বললো, "কতো মেয়ে পড়তো আমার স্কুলে। সবাইকে তো মনে রাখবার কথা নয়।" মনে মনে সে সঙ্কুচিত হয়ে পড়লো। বাইরে তার অন্য পরিচয় আছে, সে বিখ্যাত সমাজ-সুধারক ওংকারনাথজী, সে পরিচয় এখানে যে কেউ জানবে, এতে খুশী হওয়ার কথা নয়। তার উপর সে মুজরা শুনতে এসেছে তারই স্কুলের এক প্রাক্তন ছাত্রীর কাছে, এতে যেন সে নিজের কাছেই নিজে ছোটো হয়ে গেল।

তুলারীবাঈ হাসতে হাসতে ওংকারনাথের রাশভারী কথার উত্তর দিলো, বললো, "হ্যাঁ, সবাইকে মনে রাখবার কথা নয়। কিন্তু আমাকেও যে ভোলবার কথা নয় সুধারকজী। আমায় তাহলে চিনতে পারলেন না? আমি ফিরোজাবাঈয়ের মেয়ে। সে-কথা যেদিন সবাই জানতে পারলো আপনি আমায় বড়ী-বহন্‌জীর ঘরে ডাকিয়ে নিয়ে বলেছিলেন আমি যেন আর স্কুলে না আসি। আপনি সেই একদিন খুব মেহেরবাণী করেছিলেন বলে আজ আমি নামজাদী মুজরাওয়ালী। আপনিই আমার বাড়ি এসে আমায় একশো টাকার নোট দিয়ে যাচ্ছেন খুব খুশী হয়ে, যে-টাকা আপনি আপনার স্কুলের

কোনো টীচারকে সারা মাস হাড়ভাঙ্গা মেহেনত করিয়েও দিতে চান না।"

ওংকারনাথ অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "ও টাকা তুমি নেবে না?"

তুলারীবাঈ হেসে উত্তর দিলো, "না, আপনার কাছে কি করে টাকা নিই বলুন। ও টাকা স্কুলের গরীব ছাত্রীদের তহবিলে দিয়ে দেবেন। শুধু ও-টাকা কেন? আমি আরো কিছু দিয়ে দিচ্ছি—।"

নসরুদ্দীনকে বললো আরো একশো টাকা ওংকারনাথজীকে দিয়ে দিতে।

কিন্তু টাকা নিলো না ওংকারনাথজী। শুধু নিজের দেওয়া নোটটা তুলে নিলো কোনো কথা না বলে।

তারপর ছড়ি তুলে নিয়ে মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে উঠে গিয়েছিলো সেই আসর থেকে।

স্কুলের অন্যান্য মেয়েদের কথা তুলারীর বড়ো একটা মনে পড়তো না। মাঝে মাঝে শুধু মনে পড়তো কুন্তীবাঈয়ের কথা। তার কথা মনে পড়তো বিশেষ করে রাস্তায় মুড়িওয়ালা দেখলে। কুন্তীর সঙ্গে কতোদিন স্কুল থেকে লুকিয়ে বেরিয়ে এসে মুড়িওয়ালার কাছ থেকে মসলা-মুড়ি কিনে ভাগাভাগি করে খেয়েছে। এত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলো সেই কুন্তী।

তার সঙ্গে একদিন হঠাৎ দেখা হয়ে গেল নিউমার্কেটে। কুন্তীবাঈয়ের তখন বিয়ে হয়ে গেছে অনেকদিন।

তুলারীকে দেখে সে তাকে জড়িয়ে ধরলো। তারপর নানারকম আটপৌরে কথা।—তার দুটো মেয়ে হয়েছে, আর একটি ছেলে। ওরাও এখন সেই স্কুলেই পড়ে। উর্মিলা বহনজীর কথা মনে আছে? তাদের যে অঙ্ক পড়াতো? কী বকুনী একদিন খেতে

হয়েছিলো তার কাছে, এ ওর খাতা দেখেছে বলে। গঙ্গা আর রাজিন্দার ছাড়া অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে দেখাই হয় না। সবারই বিয়ে থা হয়ে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। বেচারী রাজিন্দার! তার স্বামী মারা গেছে। বড় কষ্টে আছে এখন। গঙ্গা ডাক্তারী পাশ করে বিলেত চলে গেছে।

হঠাৎ তুলারীর বুক ঠেলে দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এলো। প্রসঙ্গ পাল্টে জিজ্ঞেস করলো, "তোমরা থাকো কোথায়? তোমার স্বামী কি করেন?"

কুন্তী একটু চুপ করে রইলো। একটু সজল হয়ে উঠলো তার চোখ। তারপর আস্তে আস্তে বললো, "আমার স্বামীকে তুমি চেনো। ওঁরই কাছে আমি তোমার কথা শুনি মাঝে মাঝে।"

"আমি চিনি?" তুলারী অবাক হোলো। "নাম কি?"

নাম বললো কুন্তীবাঈ।

শুনে তুলারী স্তম্ভিত হোলো।

"সে কি! ছোটুলালজী তোমার স্বামী?"

খুব বিষণ্ণ হয়ে গেল তুলারীবাঈ। তার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক বিখ্যাত ধনকুবের ছোটুলালজী। আস্তে আস্তে বললো, "আমি আজই বলবো তাকে। তোমার স্বামী—উনি—উনি—" বলতে বলতে কথা আটকে গেল। রাগে আর লজ্জায় রাঙা হয়ে গেল তুলারীবাঈয়ের মুখ।

কুন্তী তাড়াতাড়ি তার হাত ধরে বললো, "না ভাই তুলারী, তুমি ওঁকে কিছু বোলো না। কি হবে তাতে? তুমি ওকে তোমার কাছে যেতে না দিলে ও অন্য কোথাও যাবে। আমার তাতে কোনো লাভ হবে না। বরং তোমার কাছেই যায় বলে আমি মনে মনে একটা সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করি। তুমি ওকে কোনোদিন কিছু বোলো না। জানতেও দিও না। তুমি যে স্কুলে কোনোদিন

আমার সঙ্গে পড়তে সে কথা যদি ওকে জানানোর দরকার হয় তো আমিই বলবো।”

তুলারীবাঈ অনেকক্ষণ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর আস্তে আস্তে বললো, “এবার যাই কুন্তী—।”

“এত তাড়াতাড়ি যাবে,” কুন্তী বললো, “আরেকটু দাঁড়াও। কতোদিন পরে দেখা হোলো। আবার কবে দেখা হবে কে জানে।”

“দেখা যদি হয় তো এভাবেই কোথাও না কোথাও হঠাৎ দেখা হবে,” উত্তর দিলো তুলারীবাঈ, “তুমি আমায় তোমার বাড়িতে ডাকতে পারবে না, আমার বাড়িতেও আসতে পারবে না। তুমি বড়ো ঘরের বৌ। আমি মুজরাওয়ালী।”

“ও কথা কেন বলছো,” কুন্তী খুব আহত হয়ে বললো, “আমি তো কোনোদিন ওকথা ভাবি না। আমি জানি তুমি আমার ছেলেবেলার বন্ধু।”

“একদিন অন্য সবার মতো তুমিও আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করেছিলে,” তুলারীবাঈ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললো।

কুন্তীর চোখ ছলছল করে উঠলো। ধরা গলায় বলে উঠলো, “কি করবো বলো, মায়ের মানা, বহন্‌জীদের মানা না শুনে তো উপায় ছিলো না। তখন যে ছোটো ছিলাম। তুমি তো জানো না, তুমি স্কুল ছেড়ে চলে যাওয়ার পর আমি কতো কেঁদেছিলাম। সব সময় মনে পড়তো তোমার কথা। ওঁর কাছে যেদিন প্রথম শুনলাম তোমার কথা সেদিন যে কী খুশী হয়েছিলাম বোঝাতে পারবো না। এত ইচ্ছে করছিলো তোমায় দেখবার জন্যে যে কী বলবো!”

তুলারীবাঈয়ের মন আরো বিষণ্ণ হয়ে গেল। আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, “কিন্তু ছোটুলালজী আমায় চেনেন শুনে তোমার কষ্ট হয়নি?”

“কষ্ট?” কুন্তী ম্লান হাসি হাসলো, “উনি যে রকম লোক

তাতে এই অবস্থা মেনে নেওয়া ছাড়া আমার উপায় নেই। তুমি তো প্রথম নও, ওঁর এই অভ্যেস খুব অল্প বয়েস থেকেই। বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই জানতে পেরেছিলাম। উনি নিজেই বলেছিলেন। বেশ খোলাখুলিই আমায় বলেছিলেন,—দেখ, অন্য সবার কাছে শোনার আগে আমারই মুখ থেকে শুনে নাও। আমার চরিত্র ভালো নয়। সুতরাং আমার কাছে বেশী কিছু আশা কোরো না। তুমি তোমার মতো থাকো, আমার ঘর সংসার দেখ, আমাকে আমার মতো থাকতে দাও। স্বামীর কর্তব্য আমি করবো, তোমার কোনো অযত্ন হবে না। আমি তোমার কাছে কোনোদিন কিছুই লুকোবো না। আর তুমিও দয়া করে আমায় শোধরানোর চেষ্টা কোরো না। তাতে কারো কোনো লাভ হবে না, মাঝখান থেকে তুমিই কষ্ট পাবে।—আমি আর কী করবো, দুলারী, মনের কষ্ট মনে চেপে ওর কথা মেনে নিলাম। যাই হোক আমার কাছে যে কিছুই লুকোবার চেষ্টা করেন না, তাইতেই আমি খুশী। আমার কর্তব্য আমি করে যাই, সংসার দেখি, স্বামীর যত্ন করি, ছেলে-মেয়েদের দেখাশোনা করি। এর পর ভগবান যা করেন তাই হবে।"

কুন্তীর সঙ্গে এর পর আর দেখা হয়নি।

ছোটুলালজী আসতো প্রায়ই। কিন্তু ওর সঙ্গে কোনোদিন আর সহজ হতে পারলো না। বিবেকে যে বাধতো তা নয়, সে পেশাদারী মুজরাওয়ালী, তার কাছে যে আসে, সে ছোটুলালই হোক বা যে লালই হোক সবাই সমান। সে কাউকে সেধে ডেকে আনে না, যারা আসে নিজের থেকেই আসে। সুতরাং নিজেকে মোটেও অপরাধী মনে করতে পারতো না। কিন্তু ছোটুলালকে দেখলেই তার কুন্তীর কথা মনে পড়তো, আর বড্ড মন খারাপ হয়ে যেতো।

সেই ছোটুলাল বছরখানেক পরে তার কাছে যাওয়া-আসা বন্ধ করলো। শোনা গেল যে সে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে।

শুনে প্রথমটা মনে খুব চোট পেলো দুলারীবাঈ,—ছোটুলালের জন্যে নয়, কুন্তীবাঈয়ের জন্যে। ছোটুলালের সঙ্গে যারা আসতো, তাদের কাছে ওর খোঁজ করলো। কেউ কিছু বলতে পারলো না। ওর সঙ্গে নাকি ওদের আর দেখা হয় না।

দেখা হবার কথা যে নয় সেটা দুলারীবাঈ বুঝলো। ওর দিন খারাপ পড়েছে, এসব সুদিনের বন্ধুরা যে ওর দুর্দিনে গিয়ে ওর খোঁজখবর করবে সেটা আশা করা যায় না। তবু ওদের একজনকে সে ধরে পড়লো ছোটুলালের খবর এনে দিতে।

ওর অনুরোধ ঠেলা যায় না। সে লোকটি রাজী হোলো। ছোটুলালের জন্যে বাঈজীর এতটা আগ্রহ দেখে একটু ঠাট্টামস্করা করলো বটে, কিন্তু ছোটুলালের সঙ্গে দেখা করে তার খবর নিয়ে এলো।

ছোটুলাল নতুন করে ব্যবসা করবার চেষ্টা করছে। এখন উদয়াস্ত পরিশ্রম করে। আজকাল আর কোথাও যায় না।

"ওকে একদিন এখানে নিয়ে আসুন", বললো দুলারীবাঈ।

"সে আসবে না।"

"ওকে গিয়ে বলবেন যে আমি আসতে বলেছি। আমার নাম করে বললে ও নিশ্চয়ই আসবে," আবার বললো দুলারীবাঈ।

"না বাঈজী। ও আর আসবে না। ওকে আমি বলেছিলাম। ও বললে,—আমি এখন খুব গরীব হয়ে পড়েছি। ওসব বিলাসিতা করবার পয়সা আমার নেই, শখও নেই।"

"ও নিশ্চয়ই অন্য কোথাও যায়," দুলারীবাঈ কপট অভিমান প্রকাশ করবার চেষ্টা করলো তার কথায়।

"কোথাও যায় না," উত্তর দিলো তার সংবাদবাহী, "যদি যেতো তো এখানেও নিশ্চয়ই আসতো।"

শুনে দুলারীবাঈ মনে মনে খুব খুশী হোলো। ওকে বললো, "মাঝে মাঝে আমার হয়ে ওর খবর নেবেন।"

খবর পেতো মাঝে মাঝে। আস্তে আস্তে দুর্দিনের ঝড় কাটিয়ে উঠছে ছোটুলালজী। আগের অবস্থা ফিরিয়ে আনবার সম্ভাবনা নেই যদিও, তবু এখন অবস্থা একটু ভালো হয়েছে। দিন যে চলে না, এরকম আর নয়।

অনেকদিন পরে সেই সংবাদবাহীই একদিন বললে, "বাঈজী, ছোটুলাল আজকাল বদলে গেছে। তার বৌকে খুব প্যার করে। বৌটি বড়ো ভালো। এখন ছোটুলালের সাধারণ রোজগার। কিন্তু বৌয়ের মুখে হাসি লেগে আছে। বরং যখন লাখ লাখ টাকা রোজগার করতো ছোটুলাল, সে সময়টাতে ওর বৌয়ের মুখে হাসি ছিলো না একটুও।"

এ কথা শুনে সেদিন দুলারীবাঈয়ের এত ভালো লাগলো! ওর মন ভরে উঠেছিলো এক আশ্চর্য আনন্দে, যা সে এর আগে কোনোদিন উপভোগ করে নি।

চোখে হয়তো একটু জলও আসছিলো, কিন্তু আর কেউ দেখার আগেই সে নিজেকে ঝাপসা করে দিলো এক নাচের ঘূর্ণিতে।

ওসব ঘটনা তো স্কুল ছেড়ে আসার অনেক বছর পরের কথা।

জানলায় দাঁড়িয়ে দুলারীবাঈয়ের মন আবার ফিরে গেল সেই দিনটিতে যেদিন স্কুলের সেক্রেটারি ওংকারনাথজী তাকে বলেছিলো সে যেন পরদিন থেকে আর স্কুলে না আসে।

সেদিন সে বাড়ি ফিরে ফিরোজাবাঈকে স্কুলের ঘটনা কিছু বললো না, শুধু বললো, "মা, আমি কাল থেকে আর স্কুলে যাবো না।"

ফিরোজাবাঈ ওর মুখ দেখে হয়তো বুঝলো। কোনো কথা জিজ্ঞেস করলো না, শুধু বুকে টেনে নিলো মেয়েকে।

মায়ের আদর বড়ো একটা পাওয়া যায় না আজকাল, ফিরোজা-বাঈয়ের অতো ফুরসত নেই। তাই তুলারীর আজ খুব ভালো লাগলো। ভাবলো, ভালোই হয়েছে। এই যদি স্কুল হয় তো আমার বাড়িই ভালো, আমার মা-ই ভালো।

তার পরদিন থেকে তুলারীর গানের মাস্টার এলো, কত্থক নাচের মাস্টার এলো।

এখন থেকেই তৈরী হতে হবে তুলারীকে যাতে আর পাঁচ বছরের মধ্যে মায়ের সঙ্গে সঙ্গে তুলারীও মুজরা করতে পারে।

কিন্তু উত্তরপ্রদেশের তালুকদার সেই ত্রিবেদীজী বললো, "নাচগান শিখবে বলে পড়াশুনো বন্ধ হবে এ কেমন কথা। স্কুলে না যায় যদি নাই বা গেল। বাড়িতে মাস্টার রাখো। আমি এনে দিচ্ছি এক ভালো মাস্টার।"

তুলারী খুব খুশী হয়ে রাজী হোলো।

কয়েকদিন পরে একদিন তুলারীর মাস্টার এলো।

মাস্টারকে দেখে এগারো বছরের মেয়ে তুলারী হেসে খুন। মাস্টার ষোলো বছরের এক বাচ্চা ছেলে। কি রকম ছেলেমানুষ দেখতে। মাস্টারের মতো রাশভারী নয় একটুও। ম্যাট্রিক পাশ করে সবে কলেজে ঢুকেছে।

ত্রিবেদীজী ফিরোজাবাঈকে বললো, "এ খুব গরীব। কিন্তু খুব ভালো ছেলে। তুমি ওকে যা দেবে তারই উপর নির্ভর করে ও নিজের পড়াশুনোর খরচা চালাবে।"

"তোমার নাম কি?" জিজ্ঞেস করলো ফিরোজাবাঈ।

"কমল

"তোমার বাবা কি করেন ?"

"পোস্ট অফিসে চাকরি করেন—," কমল উত্তর দিলো।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার সমস্ত খবর জেনে নিলো ফিরোজাবাঈ। এক মফঃস্বল শহরে সামান্য চাকরি করেন কমলের বাবা। ভাইবোন অনেক, বাবার সামান্য রোজগারে সংসার খুব কষ্টে চলে। কমল ফার্স্ট ডিভিশানে ম্যাট্রিক পাশ করেছে। কিন্তু তার কলেজের খরচা চালানোর সামর্থ্য নেই। সে কলকাতায় এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়ি উঠেছে। কিন্তু সেখানে অনেক অসুবিধে। ওরা ওকে বেশীদিন রাখতে রাজী নয়। তাই তার ইচ্ছে, যদি সুবিধে হয় তো কোনো মেসে বা হস্টেলে উঠে যাবে।

ফিরোজাবাঈয়ের একটু মায়া পড়ে গেল ছেলেটির ওপর। তাকে আশ্বাস দিয়ে বললো, "তুমি আমার মেয়েকে ভালো করে লেখাপড়া শেখাও। পয়সার জন্যে ভেবো না। তোমার পড়াশুনোর আর মেসে-হস্টেলে থাকার খরচা যা লাগে আমিই দেবো।"

দুলারীরও খুব ভালো লাগলো কমল ভাইয়াকে।

তার পরদিন থেকে সে খুব মন দিয়ে পড়াশুনো শুরু করলো কমলের কাছে।

ফিরোজাবাঈ কমলকে বললো, "শুধু একটা কথা মনে রেখো, আমার মেয়ে কোনো ইমতেহান পাস করতে যাবে না। আমাদের মতো নাচ আর গানকেই নিজের পেশা করে নেবে। ততোটুকু ইলম্ই ওকে দেবে যেটা হলে ও আর দশজন মেয়ের মতো স্কুলে যেতে পারেনি বলে তার দুঃখ না থাকে।"

জানলায় দাঁড়িয়ে সেই কমল মাস্টারের কথা ভাবছিলো সায়াহ্ন-যৌবনা বাঈজী দুলারীবাঈ।

কবেকার কোন সেই পুরোনো দিনের কথা,—দূরের আকাশের মতো আজও নিবিড় শ্যামল।

দুই

জানলার বাইরে রোদ্দুর আস্তে আস্তে প্রখর হয়ে উঠলো।

তুলারীবাঈ আস্তে আস্তে সরে এলো সেখান থেকে। মাথাটা বড্ডো ধরেছে।

বৃন্দা ঘরে ঢুকতে ডেকে বললো, "আমার গায়ে হাত দিয়ে দেখ তো! গা-টা একটু যেন গরম মনে হচ্ছে। জ্বর হয়েছে বোধ হয়।"

বৃন্দা তার গায়ে হাত দিয়ে দেখলো। দেখে বললো, "কোথায় জ্বর? এতক্ষণ রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে গা-টা গরম হয়ে গেছে।"

নিচের তলা থেকে উগ্রকণ্ঠ ভেসে এলো বারবনিতা-মহলের অভিধান বহির্ভূত ভাষায়।

"জানলাটা বন্ধ করে দে", বললে তুলারীবাঈ।

আজকাল তার বাংলা খুব পরিষ্কার, ঠিক বাঙালী মেয়ের মতো। উর্দূর পাট এ-বাড়ি থেকে উঠে গেছে বহুকাল আগে।

কমলের কাছেই সে বাংলা শিখেছিলো, আর শিখেছিলো একটু ইংরেজি, একটু অঙ্ক, খানিকটা ভূগোল, আর শুনেছিলো ইতিহাসের অনেক গল্প।

পড়াশুনো খুব বেশী হোতো না। হোতো শুধু গল্প। বেশির ভাগ সময় তাকে কিছু না কিছু পড়তে বা লিখতে দিয়ে কমল মুখার্জী বসে নিজের কলেজের পড়া তৈরী করতো। সে আসতো সেই সকালবেলা। তুলারীকে পড়িয়ে, নিজের পড়া তৈরী করে এখানেই চা-জলখাবার খেয়ে কলেজ করতে যেতো।

এমনি করে চার বছর কেটে গেল।

তদ্দিনে কমল মুখার্জী বি-এ পাশ করে এম-এ'তে ভর্তি হয়েছে। আর ফ্রকের বয়েস অনেক পেছনে রেখে, সালোয়ার-কামিজ-দুপাট্টার অন্তর্বর্তীকাল পার হয়ে এসে শাড়ি ধরেছে দুলারী। খুব ভালো কথক নাচ শিখেছে আর বেশ তৈরী হয়ে যাচ্ছে গানের গলা।

মাঝে মাঝে সে কমলকে গান শোনাতে চাইতো, কিন্তু কমল শুনতে চাইতো না। বলতো, "আমার গান শোনার সময় কোথায়? আমায় এক্ষুনি যেতে হবে।"

একদিন দুলারী বললো, "আজ আমার নাচ দেখে যান। একটা খুব কঠিন বোল তুলেছি।"

দুলারীর কথা শুনে হঠাৎ কি জানি কেন খুব বিষণ্ণ হয়ে গেল কমল, তাড়াতাড়ি বললো, "না ভাই, এখন বসে বসে নাচ দেখতে পারবো না। ওসব আমার ভালো লাগে না।"

সে ঘড়ি ধরে আসতো, ঘড়ি ধরে যেতো,—দুলারী পড়ুক বা নাই পড়ুক। এই ক'বছরে দুলারীর পড়াশুনার আগ্রহ একেবারে কমে গিয়েছিলো। তবু সে' ছাড়িয়ে দেয়নি কমলকে কারণ সে জানতো যে-টাকাটা কমলকে দেওয়া হয় সেটা না হলে কমলের চলবে না, তার পড়াশুনোই বন্ধ হয়ে যাবে হয়তো। আর, এখানকার মাস্টারি চলে গেলে, অন্য কোথাও এত টাকা আর কেউ দেবে না।

তখন উনিশ-শো তেত্রিশ কি উনিশ-শো চৌত্রিশ সাল। দেশের খুব দুর্দিন। টাকার অনেক দাম।

সকালটা কাটতো কমলের সঙ্গে। কমল চলে যাওয়ার পর নাচ শিখতো। তারপর চান-খাওয়াদাওয়া সেরে গানের রেওয়াজ করতে বসতো। সন্ধ্যেবেলা কিছুক্ষণ ছাতে বেড়ানো, ক্বচিৎ-কদাচিত মায়ের সঙ্গে ফিটন গাড়ি চেপে হাওয়া খেতে যেতো ময়দানে।

কখনো দুপুরে তিনটের শো'তে সুখিয়ার সঙ্গে যেতো সিনেমা দেখতে।

সন্ধ্যের পর ঢুকে পড়তে হোতো নিজের ঘরে। চার বছরের বাচ্চা বোনটিকে খেলে গল্প বলে ভুলিয়ে রাখতে হোতো, তাকে খাইয়ে দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিতে হোতো। সন্ধ্যের পর মায়ের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ থাকতো না। ফিরোজাবাঈ তখন মুজরা করতো বাইরের ঘরে, নয়তো বা মুজরা করতে চলে যেতো বাইরে কোথাও। সন্ধ্যের পর মেয়েদের ঘর থেকে বেরোনো মানা, যেদিন বাড়িতে মুজরা করতো ফিরোজাবাঈ সেদিন বাইরের ঘরের দিকেও যাওয়া মানা।

রাত কাটতে চাইতো না কিছুতেই। খানিকটা নিজের অজান্তেই মন উন্মুখ হয়ে থাকতো কখন সকালবেলা কমল আসবে তারই প্রতীক্ষায়।

কমলের সঙ্গে যেটুকু দেখা হোতো সে বাড়িতেই। বাইরে কোথাও কোনোদিন তার সঙ্গে দেখা হয় নি।

কিন্তু একদিন দেখা হয়ে গেল সেণ্ট্র্যাল এভিনিউতে।

সুখিয়ার সঙ্গে দুলারী বেরিয়েছিলো চপ্পল কিনতে। হঠাৎ দেখতে পেলো অন্যদিক থেকে কমল আসছে।

কমলের সঙ্গে আরো দুজন ছেলে ছিলো। ওরা দুলারীকে দেখে ওর দিকে তাকাতে তাকাতে চললো। কিন্তু কমল তাকে দেখেই চোখ ফিরিয়ে নিলো, তাকালোই না তার দিকে। তাকে অতিক্রম করে চলে গেল, যেন তাকে চেনেই না, দেখেই নি কোনোদিন। নিজেরা নিজেদের মধ্যে গল্প করতে করতে হেঁটে চলে গেল রাস্তার আর দশজন অপরিচিতের মতো।

দুলারীর রাগ হোলো। কিন্তু কোনো ক্ষোভ হোলো না। তার মতো কারো সঙ্গে পথে দেখা হলে যে কমলের মতো ছেলেদের দাঁড়িয়ে কথা বলার নয়, সে বোধ দুলারীর হয়েছিল। সে যেই

পরিবেশে মানুষ, সেই পরিবেশে তার মতো মেয়েরা জীবনকে সাধারণ অন্যান্য মেয়েদের চাইতে অনেক আগেই চিনে ফেলে।

তুলারীর দুঃখ হোলো না, একটুও না।

তবু রাগ হোলো। কেন হোলো বুঝতে পারলো না, তবু হোলো। ভাবলো,—কেন? তার কপালে কি ছাপ আছে যে সে বাঈজীর মেয়ে? সাধারণ একটা মিলের শাড়ি পরে সে যাচ্ছিলো জুতোর দোকানে। তাকে দেখে কি মনে হয় নি আর দশজন সাধারণ মেয়ের মতো? দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে একটু কথা বললে কী এমন ক্ষতি হোতো কমলের? বন্ধুরা জিজ্ঞেস করলে না হয় বলতো যে সে তার বোন হয় সম্পর্কে,—কি ওরকম একটা কিছু।

জুতো কিনে বেজার মুখে তুলারী চুপচাপ বাড়ি ফিরে এলো।

পরদিন কমল আসতে তুলারী এসে বললো, সে আর সেদিন পড়বে না, তার ওস্তাদ আসবে একটু পরে, তাকে গান শিখতে হবে।

সে কথা শুনে কমলের মুখ অন্ধকার হয়ে গেল।

কমলের মুখ দেখে তুলারী মনে মনে হাসলো। সে জানতো যে কমল যে সময় আসে সে সময় তার গানের বা নাচের মাস্টার কেউ এলে মনে মনে খুব চটে যেতো। মুখ ফুটে কিছু না বললেও বেশ বোঝা যেতো তার মুখ দেখে।

আজ সে ইচ্ছে করেই বললো। করুক সে রাগ। ভারী আমার মাস্টার! ওই তু-পাতা ইংরেজি-বাংলা পড়ে তো তার রুজি-রোজগার হবে না, তার পয়সা যা আসবে ওই নাচ-গান থেকেই।

কমল মুখ অন্ধকার করে চলে যাচ্ছিলো। তুলারী বললো, "সে কি! এখনই চলে যাবেন কেন?"

"তুমি যে বললে তোমার ওস্তাদ আসবে?"

"উনি আসবেন আরো একটু পরে। আপনি ততক্ষণ বসুন।"

"বসে কি করবো?" কমল জিজ্ঞেস করলো।

"সে কি কথা? আপনি নাশতা করে যাবেন না?"

কমল উত্তর দিলো, "না, আমি কিছু খাবো না।"

"ও, আমার ভুল হয়ে গেছে," তুলারী বললো, "আমরা আপনাকে খাবার দিলে আপনি খাবেন কেন? আপনারা ভদ্রলোক, ব্রাহ্মণ। আমরা মুজরাওয়ালী।"

বেদনাহত হোলো কমলের মুখ। সে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, "আমি তো সে-কথা কোনোদিন বলি নি। আমি কি এখানে আগে খাইনি কোনোদিন?"

তুলারী সে-কথার উত্তর দিলো না। বললো, "একটু বসুন, আপনার এ মাসের টাকাটা এনে দি।"

কমল চুপ করে রইলো খানিকক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে বললো, "দেখ তুলারী, আমি বছর খানেক ধরে দেখছি তোমার পড়তে বসা আর আমার পড়ানো সব মিছেমিছি।"

তুলারীও খুব আস্তে আস্তে উত্তর দিলো, "পড়াশুনো করে আমার কী লাভ বলুন। আমার তো শুধু শখের জন্যে পড়া। সে আপনিও জানেন, আমিও জানি।"

"তাহলে পড়তে শুরু করেছিলে কেন?"

তুলারীর মুখ শ্রাবণ মাসের বিকেলের মতো হোলো। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ভারী গলায় বললো, "কি জানি, ভুল হয়েছিলো আমার। এক সময় ভাবতাম অন্য সব মেয়েদের মতো আমিও স্কুলে যাবো, পড়াশুনো করবো। ওদেরই মতো বড়ো হবো। ওদেরই মতো থাকবো। ছেলেমানুষ ছিলাম তখন। কিছুই বুঝতাম না। এখন দেখছি, সে হবার নয়। আমি ওদের মতো হতে চাইলেও কেউ আমায় হতে দেবে না। আমি মুজরাওয়ালীর মেয়ে হয়ে জন্মেছি, আমাকেও মুজরাওয়ালী হতে হবে। আমার আর কোনো পথ নেই।"

"কেন পথ থাকবে না," কমল আদর্শবাদের আশ্রয় নিলো, পথ করে নেওয়ার ইচ্ছে থাকলে, শক্তি থাকলে ঠিক পথ করে নেওয়া যায়।"

তুলারী হাসলো, "আমার ইচ্ছেও আছে, শক্তিও আছে। কিন্তু উপায় নেই। সব কিছু আমার একলার উপর নির্ভর করে না।"

"কেন উপায় থাকবে না?"

তুলারী তাকিয়ে দেখলো কমলকে। তারপর খুব নরম গলায় বললো, "আচ্ছা, আপনি একটা উপায় করে দিন তো দেখি। একটি ভালো ছেলের খোঁজ এনে দিন। আমি বিয়ে করে সংসার করবো।"

কমল চুপ করে রইলো।

তুলারী বলে গেল, "মনে করবেন না কাজটা আমার পক্ষে খুব সোজা। আজ ভদ্রঘরের কোনো ভালো ছেলের আমাকে বিয়ে করতে চাওয়া যতো না শক্ত, তার চেয়ে অনেক বেশি শক্ত আমি মুজরাওয়ালী না হয়ে বিয়ে করে ঘর সংসার করা। বিশ্বাস হচ্ছে না? মাকে একবার বলে দেখুন। মা আমার সব কিছু সহ্য করবে, কিন্তু কাউকে বিয়ে করে সাদাসিধে ভাবে ঘর-সংসার করা কিছুতেই সহ্য করবে না।—তবু আমি বলছি, আমার ইচ্ছে আছে, শক্তি আছে। আপনি তো আমার গুরু, আমায় লিখতে পড়তে শিখিয়েছেন। আপনি আমার পথ করে নেওয়ার রাস্তা বলে দিন।"

কমল কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলো।

"পারলেন না তো," তুলারী হাসতে হাসতে বললো, "তাহলে বুঝে দেখুন কেন আমার পড়াশুনো করার কোনো মানে হয় না।"

কমল তাকিয়ে দেখলো তুলারীকে, তারপর প্রবল অনিচ্ছাসত্ত্বেও না বলে পারলো না, "যদি বলো তো কাল থেকে আর আসবো না।"

"সে আপনার ইচ্ছে," তুলারী উত্তর দিলো।

"বেশ আমি আর আসবো না," বললো কমল।

তখন তুলারী জিজ্ঞেস করলো, "কিন্তু এখান থেকে যে-টাকাটা পান সেটা বন্ধ হয়ে গেলে আপনার অসুবিধে হবে না?"

"অসুবিধে একটু হবে নিশ্চয়ই," কমল উত্তর দিলো, "কিন্তু আমি ব্যবস্থা একটা করে নেবো।"

ডুলারী তার ডাগর চোখ মেলে তাকালো। বলে উঠলো, "আপনি আর আসবেন না ?"

"এসে কি করবো ?"

"হ্যাঁ, তা তো বটেই, আর এসে কি করবেন," বললো ডুলারী, "আপনি তো শুধু টাকার জন্যেই আসতেন। এর পর তো আর আসার প্রয়োজন নেই।"

"তা তো নেই। আমি শুধু টাকার জন্যে আসতাম," বলে কমল মেঘের মতো অন্ধকার মুখ করে উঠে দাঁড়ালো।

ডুলারী তাড়াতাড়ি তার হাত ধরে বললো, "না, না, আপনি যাবেন না।"

"শুধ্ বসে বসে কি করবো ?" কমল জিজ্ঞেস করলো।

আর কি বলবে ভেবে না পেয়ে ডুলারী বললো, "আজ আমার গান শুনে যান।"

"কী হবে গান শুনে," হাল্কা একটুখানি নিশ্বাস ফেললো কমল।

"বাঈজীর গান নয় মাস্টারজী," ডুলারী হেসে উত্তর দিলো, "বেশ ভালো গান গাইতে পারে আপনার ছাত্রী ডুলারী, আজ তার গান শুনে যান।"

কমল খুব আস্তে আস্তে খুব গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলো, "যদি গান শুনে নেশা লেগে যায় ? যদি এর পর প্রায়ই গান শুনতে আসি ?"

ডুলারীর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল, হঠাৎ কেউ যেন চাবুক মেরেছে তাকে। কিন্তু তক্ষুনি সামলে নিয়ে সহজ ভাবে হেসে বললো, "ওভাবে যদি গান শুনতে আসেন, তাহলে আপনাকে কোনোদিনই এ বাড়িতে আসতে দেবো না।"

কমল খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো তার দিকে। তারপর আবার বসে পড়লো।

বসে পড়ে বললো, "যাও, চা নিয়ে এসো, মিষ্টি নিয়ে এসো।

যা খুশি নিয়ে এসো। তারপর তোমার গান শোনাও, বেড়ালের ডাক শোনাও, যা খুশি শোনাও।”

দুলারী হাসতে হাসতে চা আর খাবার আনতে গেল কমলের জন্যে। অন্যান্য দিন সুখিয়াই নিয়ে আসে। আজ দুলারী নিয়ে এলো নিজের হাতে বয়ে। তারপর হারমোনিয়াম টেনে নিলো।

গান শোনালো দুলারী। ঠুমরি নয়, গজল নয়, দাদরা নয়, শোনালো কয়েকটা ভজন,—মীরার, কবীরের, সুরদাসের।

কমল চুপ করে গান শুনলো। গান যখন শেষ হোলো দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর দুজনেই চোখ নামিয়ে নিলো কান লাল করে। তারপর আবার দুজনে তাকালো দুজনের দিকে। একটুখানি হাসি ঝিলমিল করে উঠলো দুজনের ঠোঁটে।

তারপর দুলারী আবার চোখ নামিয়ে নিলো। কমল আস্তে আস্তে উঠে পড়লো।

কমল চলে যাওয়ার সময় দুলারী তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলো। দরজার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, “কাল ক’টায় আসবেন ?”

কমল মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বললো, “এরকম সময়েই আসবো।” বলে চলে গেল।

দুলারী দাঁড়িয়ে রইলো জানলায়। দেখলো কমল ছোটো গলি থেকে বেরিয়ে বড়ো রাস্তার জনতায় মিশে গেল। তার পরও দুলারী অনেকক্ষণ জানলায় দাঁড়িয়ে রইলো। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো বড়ো রাস্তায় লোকজনের অবিরাম আসা যাওয়া। মনে মনে ভাবলো, আমায় জন্ম দেওয়ার আগে ভগবান যদি আমায় ডেকে জিজ্ঞেস করতো—তুমি কি হয়ে জন্ম নিতে চাও, আমি বলতাম—আর কিছু নয়, আমি হতে চাই শুধু পথের পথিক, কোথা থেকে আসছি সে কথা কেউ জানবে না, কোথায় যাচ্ছি তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না, শুধু এক নজর দেখবে যে এত লোকের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে আমিও পথ চলেছি সকাল বিকেল সন্ধ্যে।

সেদিন তুলারী আর গান শিখলো না, নাচের মাস্টার আসতে তাকেও চলে যেতে বললো। সারাদিন বিছানার উপর উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে রইলো।

কমল পরদিন এলো, তার পরদিন—তার পরদিনও।

তুলারী তাকে শরবত খাওয়ালো, নাশতা খাওয়ালো।

তারপর বই খুলে তু-চারপাতা উল্টে পাল্টে গেল। পড়ায় তার কোনো উৎসাহ দেখা গেল না, কমলেরও উৎসাহ দেখা গেল না পড়ানোতে।

সে নিজের থেকেই তুলারীর গান শুনতে চাইলো।

একদিন ফিরোজাবাঈ তুলারীকে ডেকে বললো, "সিংদেওজীকে দেখেছো? বড়ো খানদানী ঘরের ছেলে। ওর বাবার বড়ো ভাই কোথাকার যেন রাজা। খুব রইস লোক এই সিংদেওজী। তোমার কথা তাকে সেদিন বলছিলাম। তোমার গান শোনবার ফরমাশ করেছেন। এখন থেকে তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে মুজরা করতে পারো মাঝে মাঝে। ঠিক করেছি কাল সন্ধ্যে থেকে তুমি আমার সঙ্গে বসবে।"

তুলারী মায়ের কথার কোনো উত্তর দিলো না। তার মন ভার হয়ে রইলো সারাদিন।

বৃন্দা জানলাটা বন্ধ করে দেওয়ার পর তুলারীবাঈ আবার বিছানায় শুয়ে পড়েছিলো। বেশ জ্বর-জ্বর মনে হচ্ছে। মাথাও ধরেছে বেশ।

বৃন্দাকে ডাকলো পাশে বসে মাথাটা টিপে দিতে।

আস্তে আস্তে মাথা টিপে দিতে লাগলো বৃন্দা। দুলারীবাঈ চোখ বুঁজে নিসাড় হয়ে পড়ে রইলো। এই কদিন যেন পুরোনো দিনগুলো বড্ডো মনে পড়ছে, বেশি করে মনে পড়ছে।

বৃন্দার হাতটা বড্ড শক্ত, ঠিক ছেলেদের হাতের মতো।

মনে পড়লো, কমলও একদিন এমনি করে তার মাথা টিপে দিয়েছিলো।

সেদিনকার কথা আবার মনে পড়লো—তার আগের দিন ফিরোজাবাঈ তাকে বলেছিলো, "এখন থেকে তুমি আমার সঙ্গে মুজরা করতে পারো মাঝে মাঝে, ঠিক করেছি কাল সন্ধ্যে থেকে তুমি আমার সঙ্গে বসবে।"

মায়ের কথা শুনে দুলারী কোনো উত্তর দেয়নি। সারাদিন তার মন ভার হয়ে রইলো।

তার পরদিন সকাল বেলা মনে হোলো যেন একটু মাথা ধরেছে,—না, ঠিক মাথা ধরেনি, একটু ভার হয়ে ছিলো, মনে হোলো যেন সত্যি সত্যি খুব মাথা ধরলে বেশ হয়। সন্ধ্যেবেলা সেই সিংদেওজী, কোথাকার যেন এক ক্ষুদে রাজার ক্ষুদে ভাইপো, খুব নাকি রইস লোক, সে আসবে। মাথাটা ধরে থাকলে বেশ হয়। একটা ছুতো পাওয়া যায় গান না গাইবার?

কিন্তু এ বেলা যখন কমল আসবে, তখন? কমল এলে মাথা ঠিক থাকবে, আর সিংদেওজী আসবার সময় হলে মাথা ধরবে,—এসব ওর মা ফিরোজাবাঈ মানবে না।

দুলারী স্থির করলো কমল এলেও দেখা করবে না। সুখিয়াকে বলে দেবে ওকে চলে যাওয়ার জন্যে বলে দিতে। ওকে আর কি দরকার? দুলারী যাতে একেবারে নিরক্ষর না হয়, তারই জন্যে তাকে রাখা হয়েছিলো, বড়ো ঘরের মেয়েদের মতো লেখাপড়া

শেখানোর জন্যে তো রাখা হয়নি। কমলকে আর কষ্ট দিয়ে, ওর সময় বরবাদ করে কী লাভ। তুলারী বাঈজীর মেয়ে, তাকেও যখন বাঈজীই হতে হবে, তখন কমলকে আর কেন?

একবার ভাবলো সুখিয়াকে ডেকে বলে দিই কমলবাবু যখন আসবে, ওকে যেন বলে দেওয়া হয় যে ওর আর আসবার দরকার নেই।

তারপর ভাবলো, না, ও আগে আসুক তো! তারপর দেখা যাবে। যা বলবার সে নিজেই বলে দেবে'খন।

সময়ের অতি মন্থর গতি যখন সত্যি সত্যিই তার মাথা ধরিয়ে দেবার উপক্রম করেছে, এমন সময় সুখিয়া এসে খবর দিলো যে কমলবাবু এসেছেন।

তুলারী একটু ভাবলো, তারপর বললো, "বাবুকে এখানেই পাঠিয়ে দে।"

সুখিয়া মুখ টিপে হেসে চলে গেল।

কমল ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলো, "কি হয়েছে তুলারী?"

তুলারী অস্বস্তিভরে দু-তিন বার এপাশ ওপাশ করলো, তারপর বললো, "বড্ডো মাথা ধরেছে।"

কমল ভেবে পেলো না তার কি একটু বসা উচিত, না চলে যাওয়া উচিত।

"দাঁড়িয়ে কেন?" বললো তুলারী, "বসুন না।"

কিন্তু কোথায় বসবে কমল? চারিদিকে তাকিয়ে দেখলো, ঘরের ভিতর কোথাও একটি চেয়ার নেই।

তুলারী বিছানার এক পাশে সরে গিয়ে বললো, "এখানেই বসুন।"

কমল বসলো।

তুলারী চোখ বুঁজে পড়ে রইলো।

কমল চুপ করে বসে রইলো অনেকক্ষণ। তারপর বললো,

"আজ তোমার যখন শরীর খারাপ তুমি শুয়েই থাকো। আমি যাই। দু-তিন দিন পরে আসবো'খন।"

"না", বললো দুলারী।

"কি? আসবো না?" একটু যেন হতাশ হয়ে কমল জিজ্ঞেস করলো।

"না, সে কথা বলছি না। বলছি—এরই মধ্যে উঠবেন কেন? একটু বসুন।"

কমল আরো কিছুক্ষণ বসলো। দুলারী চোখ বুঁজে রইলো। কমলও রইলো চুপ করে।

একটু পরে কমল বললো, "আমি এবার যাই।"

"না", বললো দুলারী।

"বসে কি করবো তবে?"

"মাথাটা একটু টিপে দিন। বললাম না, বড্ড মাথা ধরেছে!"

কমল প্রথমটা একটু ইতস্তত করলো। তারপর সামনে ঝুঁকে পড়ে দুলারীর মাথা টিপে দিতে লাগলো।

চুপচাপ চোখ বুঁজে পড়ে রইলো দুলারী।

কিছুক্ষণ পরে কমল বললো, "অনেক বেলা হয়ে যাচ্ছে। আমি এবার যাই।"

"না", বললো দুলারী।

কমল আস্তে আস্তে হাত সরিয়ে নিলো দুলারীর কপাল থেকে। সরিয়ে নিতেই দুলারী কমলের হাতটা চেপে ধরলো, বললো, "এখন যাবেন না। আরেকটু বসুন।"

"আমায় যে যেতে হবে দুলারী—"

"যেতে পারেন তো যান। হাতটা ছাড়িয়ে নিন তো দেখি কত জোর আপনার।"

কমলের মন দুলে উঠলো। কি রকম যেন একটা মমতা বোধ করলো দুলারীর জন্যে। একটু হেসে বললো, "আমার কলেজ আছে, দুলারী।"

"একদিন কলেজে নাই বা গেলেন," ত্বলারী চোখ না খুলেই বললো।

কমল একটু চুপ করে রইলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা, ত্বলারী, আমায় একটা কথা বলবে ?"

"কি ?" ত্বলারী খুব ক্লান্ত গলায় বললো।

"তোমার কি সত্যি সত্যি মাথা ধরেছে, না কি মন খারাপ বলে মাথা ধরেছে বলে মনে হচ্ছে ?"

ত্বলারী অনেকক্ষণ কোনো উত্তর দিলো না। শুধ্ কমলের হাতটা চেপে ধরে চোখ বুঁজে রইলো। তারপর আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা, কমলবাবু, অন্য-অন্য সব মেয়েরা খুব সুখী,—না ?"

"সুখী ? কেন ? তুমিই বা এমন কি অসুখী ?"

ত্বলারী এবার চোখ খুললো। বললো, "ওরা পড়াশুনা করে, বিয়ে-থা করে, ঘর সংসার করে। আমাদের মতো তো নয়।"

কমল প্রথমটা কোনো উত্তর দিতে পারলো না। তার বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠলো। তারপর বললো, "তুমিও যদি তাই করতে চাও, তোমায় আটকাচ্ছে কে ?"

ত্বলারী একটু হাসলো। উত্তর দিলো, "আপনি জানেন না। আজ একজন সিংদেওজী আসছেন। কোথাকার যেন এক রাজ-পরিবারের ছেলে। উনি আসছেন মুজরা শুনতে। আমাকেও মায়ের সঙ্গে গান গাইতে হবে।"

কে যেন কমলের মুখের রক্ত নিঙড়ে নিলো।

তাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো ত্বলারী। একটু অপেক্ষা করলো। যখন দেখলো যে কমল কিছুই বলছে না, তখন নিজের থেকেই কথা শুরু করলো। জিজ্ঞেস করলো, "কমলবাবু, আমরা যে বাঈজী এ কথা তো আপনি জেনে শুনেই এসেছিলেন ?"

"হ্যাঁ, এ কথা জেনেশুনেই এসেছিলাম," কমল উত্তর দিলো।

"এসেছিলেন শুধু টাকার জন্যে," বলে ঠোঁট কামড়ালো

"হ্যাঁ, টাকার জন্যেই এসেছিলাম," খুব সহজভাবে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করলো কমল, "এখানে যে-টাকা পাই সে-টাকা অন্য কোথাও ছেলে পড়িয়ে পেতাম না। আমি গরীব মানুষ, নিজের রোজগারে পড়াশুনোর খরচা চালাতে হয়। অতো বাছবিচার করলে আমার কি করে চলে?"

একটু আনমনা ছিলো দুলারী। কমলও চুপ করে রইলো।

খানিকক্ষণ পরে দুলারী জিজ্ঞেস করলো, "আপনাদের বাড়ির লোক কি জানেন যে আপনি এখানে আসেন।"

"না, জানেন না," কমল বললো।

"আপনার বাবা যদি জানতে পারেন?"

"উনি খুবই দুঃখিত হবেন," সোজাসুজি উত্তর দিলো কমল। খুব নির্বিকার ভাবে উত্তর দিলো।

ওদের কেউই জানলো না যে, প্রত্যেকের প্রত্যেকটা কথায় অন্য-জনের বুকে একটি একটি করে কাঁটা বিঁধছে।

দুলারী আস্তে আস্তে বিছানার উপর উঠে বসলো। একটু ম্লান হাসি হাসলো। তারপর বললো, "আপনার আর এখানে আসবার দরকার নেই কমলবাবু।"

"বেশ আসবো না," বলে কমল উঠে দাঁড়ালো।

ফিরোজাবাঈ যাচ্ছিলো ঘরের পাশ দিয়ে।

দুলারী ডেকে বললো, "মা, কমলবাবু কাল থেকে আর আসবেন না।"

"কেন?" বলে ফিরোজাবাঈ ঘরের ভিতর ঢুকলো।

"আমিই বলছিলাম, ওঁর আসবার কি দরকার। আমার তো সময় হবে না।"

"কেন সময় হবে না, খুব হবে।"

"সময় হলেও বা," ডুলারী মুখ ভার করে বললো, "আমার পড়া-শুনো করে কী লাভ?"

"একটু পড়াশুনো করা ভালো," ফিরোজাবাঈ উত্তর দিলো, "নানা রকমের লোকের সঙ্গে দেখাশোনা হয়, একটু লেখাপড়া জানা না থাকলে কি করে চলবে? সকাল বেলা ওঁর কাছে বসে এক-দেড় ঘণ্টা ওঁর কথা শুনলেও অনেক উপকার হবে।"

"উনি বলছেন, উনি আসতে পারবেন না।"

"খুব পারবেন।"

"ওঁর সময় হবে না।"

"খুব সময় হবে," বললো ফিরোজাবাঈ, "তুমি ওর কথায় কান দিয়ো না কমলবাবু, ও শুধু তোমায় জ্বালানোর জন্যে এসব বলছে।"

ফিরোজাবাঈ বেরিয়ে চলে গেল।

ডুলারী হেসে ফেললো। "কেমন, এখন হোলো তো। এখন দেখি আপনি কি রকম না এসে পারেন।"

কমল চলে গেল। বহু ইচ্ছে সত্ত্বেও কিছুতেই ডুলারীকে বলতে পারলো না যে, আমি তো নিজের থেকে আসবো না বলিনি, তুমিই আমায় আসতে মানা করে দিচ্ছিলে।

কমল চলে যাওয়ার পর কি জানি কেন বার বার ত্রিবেদীজীর কথা মনে পড়ছিলো।

উনিই এ-বাড়িতে প্রথম নিয়ে এসেছিলেন কমলকে। ওকে তিনি চিনতেন না। কমলদের কলেজের এক প্রফেসার তাঁর বন্ধু। তাঁর কাছে একজন টিউটার চাইতে তিনি কমলকে ওঁর কাছে পাঠিয়ে দেন।

অনেকদিন দেখা হয়নি ত্রিবেদীজীর সঙ্গে। সেই যে বছর দুয়েক আগে একবার এসেছিলেন, তারপর আসেন নি। এখন এলাহাবাদে না কানপুরে কোথায় যেন আছেন।

প্রত্যেক বছর দেওয়ালীর সময় শাড়ি আর টাকা পাঠাতেন

ছুলারীর জন্যে। গত বছর তাও পাঠান নি। মাঝখানে খবর এসেছিলো যে ওঁর খুব অসুখ।

সে কথা শুনে ছুলারী খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু ফিরোজাবাঈ একেবারে নির্বিকার। মায়ের মনোভাব দেখে ছুলারীর মনে খুব লেগেছিলো।

ত্রিবেদীজী এখন যদি আসতেন,—ছুলারী ভাবলো,—আমি ওঁকে বলতাম, আমায় এখান থেকে নিয়ে চলুন, আমি মায়ের সঙ্গে থাকবো না, আমি কমলবাবুর কাছে পড়বো।

ভাবতে ভাবতে ছুলারী নিজের মনে ম্লান হাসি হাসলো। ত্রিবেদীজীকে সামনে পেলেও, একথা বলবার জোর তার কোথায়? ত্রিবেদীজী তার কে হয়, সে-কথা সে এদ্দিনে জানলেও, অন্য কেউ তো সে কথা মানবে না।

সে মুজরাওয়ালীর মেয়ে। তাকেও মুজরা করতে হবে। আর, আজ না হোক কাল যখন করতেই হবে, তখন আজ আর মাথা ধরার ভান করে পড়ে থেকেই বা কী লাভ। তার চাইতে ছুপুরে একটু ঘুমিয়ে নিলে সন্ধ্যেবেলা মন অনেক হাল্কা হয়ে যাবে।

সেদিন রাত্রে ছুলারী প্রথম মুজরাতে গান গাইতে বসলো মায়ের সঙ্গে। প্রথম দিনেই তার নাচতে লজ্জা করছিলো। লজ্জার নাম শুনে ফিরোজাবাঈ অবাক হলেও কোনো রকম পিড়াপিড়ি করেনি। বয়েস হয়ে আসছিলো এবং শরীরে মেদের প্রাচুর্য ঘটেছিলো বলে ফিরোজাবাঈ নিজে আর নাচতো না। শুধু ভাও দিয়ে গান গাইতো। তাই সেদিন রাত্তিরে নাচতে নিয়ে আসা হয়েছিলো আয়েশা নামে আরেকটি মেয়েকে।

সুখিয়াকে ছুলারী বলেছিলো,—আমার একটু ভয় ভয় করছে।

ভয়! সুখিয়া হেসে ফেলেছিলো। বাঈজীর মেয়ের মুজরা করতে ভয়!

কি করে বোঝাই সুখিয়াকে,—তুলারী ভেবেছিলো,—মুজরাতে গান গাইতে যে ভয়, তা তো নয়, এ তার রক্তে আছে। কিন্তু ফিরোজাবাঈ যে বলে গেল, তার গান শুনতে আসবে কোন এক সিংদেওজী, কোথাকার কোন এক রাজ-পরিবারের ছেলে, তাইতে যেন মনে কি রকম ভয় ধরে গেল।

কিন্তু সন্ধ্যের পর ঝাড়-লণ্ঠনের নিচে মায়ের পাশে বসে তার সব ভয় কেটে গেল। মায়ের নির্দেশ মতো সে তসলীম জানালো সিংদেওজীকে, কিন্তু ভালো করে তাকিয়ে দেখলোই না। প্রথমদিকে একটু হাসি-মস্করা করছিলো সিংদেওজীর ইয়ার মোসায়েবেরা। কিন্তু গান জমে উঠতে সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল।

তুলারী ভুলেই গেল যে মুজরাতে গান গাইছে সে। তার খুব ভালো লাগছিলো মায়ের সঙ্গে সঙ্গে গান গাইতে। বার বার মনে হচ্ছিল,—বাঃ, এমন মা আমার, কী সুন্দর গান গায়!

ফিরোজাবাঈও যেন ভুলে গেল তার পরিবেশ, ভাবলো,—কী ভালো তালিম নিয়েছে আমার মেয়ে।

গানের ভিতর দিয়ে মা আর মেয়ে তুজন তু-জনের কাছে মা-মেয়ের ভালবাসা উজাড় করে দিলো।

এই মাধুর্যের ঘোর কাটলো গানের শেষে সিংদেওজীর তারিফ শুনে। ইনাম প্রত্যাখ্যান করতে পারলো না। সেটা বেয়াদপি হয়। কিন্তু বেশিক্ষণ বসলো না। উঠে চলে গেল।

সিংদেওজী যে নজর লাগিয়ে দেখছিলো তুলারীকে, এটা ফিরোজাবাঈয়ের ভালো লাগলো। মুখে বললো, "ওর আজ তবিয়ত ঠিক নেই। সকাল থেকে মাথা দরদ করছে। শুধু আপনার মতো রইস লোকের ফরমাশ আছে বলেই ও আজ গান গাইতে বসেছিলো।

সিংদেওজী একটু চুপচাপ ভাবলো, তারপর আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, "ওর একলার মুজরা হবে কবে?"

"আপনি যেদিন হুকুম করবেন," উত্তর দিলো ফিরোজাবাঈ।

কমল সেদিন এসে লক্ষ্য করলো তুলারী নাকে একটি ছোটো নথ পরেছে। বেশ সুন্দর, হীরে আর পান্না বসানো নথ।

জিজ্ঞেস করলো, "একি, নাকে নথ পরেছো কেন? কী বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে!"

তুলারী হাসলো। বললো, "ওটা পরা আমাদের রেওয়াজ। যেদিন থেকে মুজরাতে গান গাইতে শুরু করবো সেদিন থেকেই আমাদের নাকে নথ পরতে হয়। কেউ কেউ নোলক পরে। একে আমরা নথুন বলি। আমাদের পরতে হয়।"

"কই, তোমার মা তো পরেন না?"

তুলারী হেসে ফেললো, উত্তর দিলো, "না, মা পরেন না।"

"কেন?"

"আপনি একেবারে বোকা। কিচ্ছু জানেন না," বললো তুলারী, "নথুন পরে শুধু কুমারী বাঈজী। যখন কুমারী আর থাকে না তখন নথুন পরে না। কুমারী বাঈজীর নথুন খোলানো সব পুরুষের সাধ্যে কুলোয় না। কারো কারো নথুন খোলাতে তো এক একজন রইস লোকের দৌলতখানা উজাড় হয়ে যায়। আমরা একে বলি নথুন উতারনা।"

খুব সহজ ভাবে বলে গেল তুলারী। কিন্তু কমলের কান তুটো লাল হয়ে গেল।

সেদিন সে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

কয়েকদিন পরে একদিন তুলারী বললো, "জানেন কমল বাবু, আমার নাচ দেখে সিংদেওজী আমায় একটা জড়োয়া নেকলেস ইনাম দিয়েছেন। নেকলেসটা দেখবেন?"

কমল অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলো, "না, আমি দেখতে চাই না।"

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আবার সহজ হয়ে গেল।

এক সময় বললো, "তুলারী, আমি কোনদিন মুজরা দেখিনি, আমায় দেখাবে একদিন?"

তুলারী একটি অদ্ভুত চাউনি দিয়ে তাকালো কমলের দিকে। তারপর বললো, "হ্যাঁ, দেখাবো। পরশু সন্ধ্যেবেলা এখানে খোলা মুজরা হবে। সেদিন আসবেন।"

"খোলা মুজরা কী ব্যাপার?" কমল জিজ্ঞেস করলো।

"আপনি জানেন না? মুজরা দু-রকমের হয়। কারো ফরমায়েশে হয় তাদের বাড়িতে বা আমাদের এখানে, শুধ্ তাদের জন্যে। সেখানে শুধ্ তাদের ইয়ার-বন্ধুরা আসে, বাইরের লোক সেখানে আসে না। আরেক রকম হয় খোলা মুজরা। এখানেই হয়। সেই মুজরায় যার খুশী সেই আসতে পারে।"

দিন তুই পর একদিন সন্ধ্যেবেলা।

কলকাতায় তখন প্রথম ফাল্গুনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে।

কোঁচানো ধুতি আর চুনট করা পাঞ্জাবী পরে কমল এলো মুজরা দেখতে।

এ বাড়িতে এতদিন ধরে এতবার এসেছে, কিন্তু সন্ধ্যেবেলা এই প্রথম। দেখলো এ পাড়ায় সন্ধ্যার আবহাওয়া একেবারে অন্য রকম। একেবারে চেনাই যায় না। দিনের বেলা কানা গলির ঠাসাঠাসি পরিবেশে বড্ড গুমোট মনে হোতো তার, মনে হোতো কি রকম যেন একটা নোংরা বীভৎস পরিচ্ছন্নতা চারদিকের ঘরে ঘরে। প্রায় সবারই চোখের চারদিকে কালো ছায়া, একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে মেপে দেখে প্রত্যেক আগন্তুক আর প্রত্যেক পথচারীকে।

চারদিকের নিশ্চল হাওয়ায় একটি গুমোট দেহজ গন্ধ, একটা তন্দ্রাঘন নিশান্তের ক্লান্তি, সূর্যের কিরণবঞ্চিত জংলা পঙ্কিল জলভূমির বিষাক্ত গ্যাসের ভাপের মতো।

এ পথে ঢুকলে তার দম বন্ধ হয়ে আসতো। কোনোরকমে সদর দরজাটুকু পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে তুলারীর ঘরে পৌঁছাতে পারলে সে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচতো, কারণ সেখান থেকে জানলার ওপারে দেখা যেতো হাওড়ার পুলের ওপারে এক টুকরো নীল আকাশ।

কিন্তু সেদিন সেই সন্ধ্যার পরিবেশে বাইরে যখন পথের পাশের গ্যাসের নিস্তেজ আলোয় ঝাপসা-নীল অন্ধকার, যখন বেলফুলের মালা, মুকুট আর বাজুবন্ধ ফেরি করে বেড়াচ্ছে এক অর্ধভুক্ত শীর্ণ উড়িয়া মালাকর, পানের দোকানের একপাশে কে যেন একজন গোলাপী গেঞ্জি পরে একমাথা বাবরী চুল নিয়ে তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছে প্রত্যেকটি পথিককে, সস্তা গজল গানের কলি আর ঘুঙুরের ঝুম ঝুম শব্দ আর পেশাদারী হাসির হুল্লোড় ভেসে আসছে এ-বাড়ি ও-বাড়ির দোতলা-তেতলার চিকের পেছনে ফিকে-নীল আলোয় ছমছমে ঘরগুলোর ভেতর থেকে,—তেমনি সময় আধো-অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে এক দূরাগত গজলের কাছাকাছি হতে হতে হতে হতে হতে হঠাৎ এক ঝাড়-লণ্ঠন-ঝলমলো চোখ ঝলসানো ঘরে ঢুকে পড়ে কমলের মনে হোলো, সে যেন এক অচেনা পৃথিবীতে এসে পড়েছে। সে নিজেও যেন তার নিজের কাছে একটা নতুন রূপ নিয়ে এলো। মনের এক অজানা অন্ধকার সমুদ্রে তুফানী রাত্রির উত্তাল ঢেউ ফুলে ফুলে উঠলো। নীতিবাদ-ক্লিষ্ট রক্ষণশীল আবহাওয়ায় বড়ো হওয়া মনের সমস্ত সংযম-পন্থী অনুশাসনের বালিয়াড়ি ভেঙে ধ্বসে ভেসে গেল সেই সব ঢেউয়ের ঝাপটায়।

একটু আশ্চর্য মধুর আমেজ লাগলো এই পরিবেশে, ভালো

লাগছে কিনা সেটা অনুভব করতে না পারলেও, খারাপ যে লাগছে না সে-কথা বেশ বুঝতে পারলো। মনে হোলো যেন একটা সংস্কারক্লিষ্ট রক্ষণশীল মধ্যবিত্ত মনকে সে রেখে এসেছে বাইরে ফটকের পাশে পথের উপর, যেন তার এই নতুন অচেনা আমি-টা নেশাবিহ্বল হয়ে টলতে টলতে যখন আবার বাইরে বেরিয়ে আসবে, তার মনের পুরোনো চেনা আমি-টা বিশ্বস্ত অনুচরের মতো তাকে ধরে ধরে পথ চিনিয়ে ঠিকমতো বাড়ি পৌঁছে দিতে পারবে।

কে একজন কমলকে সাদর আহ্বান জানালো, এক নজর দেখে তার মুখের চেহারা কমলের ভালো লাগলো না। সে তাকালোই না তার দিকে। ভেতরে গিয়ে গালচের এক পাশে বসলো। তাকিয়ে দেখলো চারদিকে। দেখলো, কয়েকজন এদিক ওদিকে ছড়িয়ে বসে আছে। কারো চোখে একটা সুরারক্ত ঘোলাটে ঘোর, কারো কারো মুখ পানের রসে কালচে লাল। শুনছে, তারিফ করছে, টাকা রেখে দিচ্ছে থালার উপর, তারপর একসময় উঠে চলে যাচ্ছে নতুন অভ্যাগতের জায়গা করে দিয়ে।

খাম্বাজে একটা ঠুমরি গাইছিলো দুলারীবাঈ: কাহে সতাবো মোরে শ্যাম······। সমের সঙ্গে সঙ্গে চোখের তির্যক ভঙ্গি করে সে মাতিয়ে তুলছিলো তার শ্রোতাদের। কখনো বা তার গানের সঙ্গে সঙ্গে দু-এক চক্কর নেচে যাচ্ছিলো তার সঙ্গিনী আয়েশাবাঈ।

কমলের কান দুটো লাল হয়ে গরম হয়ে গেল।

তার মনে হোলো এ তো তার চেনা দুলারী নয়, এ একজন অন্য কেউ। পরনে তার বুটিদার বেনারসী শাড়ি, গায়ে আঁট ব্রোকেডের শরমবিহীন চোলি, হাতে বাজুবন্ধ, কোমরে গোট, গলায় জড়োয়া নেকলেস, মাথায় সোনার চিরুণী,—আর নাকে হীরে-ঝলমল নথ। ডান পা ভাঁজ করে বসে, বাম পা হাঁটুর কাছে মুড়ে উঁচু করে, হাঁটুর উপর বাম হাতের কনুই রেখে, কান চেপে, ডান হাতে ভাও দিয়ে ঠুমরি গাইছে এক কুমারী বাঈজী, এখনো

যার "নথুন উতারনা" বা নথ খোলানো হয়নি। তার পেছনে হারমোনিয়াম, বাঁয়া তবলা আর সারেঙ্গি নিয়ে বসেছে তিনজন লোক। পাশে বসে আরেকটি মেয়ে, পরনে তার চুড়িদার পায়জামা, ঘাগরা, সাটিনের জামা আর জরির কাজ করা জাকিট। থেকে থেকে উঠে পড়ে তবলার বোলের সঙ্গে পায়ের কাজ দেখাচ্ছে সে, আর চারদিক থেকে তারিফ করে উঠছে সবাই। এক সময় শুধু একটি থালা রেখে তার কানার উপর পা দুটো চেপে দাঁড়িয়ে তবলার অতি-দ্রুত বোলের সঙ্গে নাচতে লাগলো সে আর ঘরের অন্যান্য সবাই সমস্বরে বাহবা দিয়ে উঠলো।

এ ধরনের নাচও কমল আগে কোনোদিন দেখেনি। বড় বড় নৃত্যশিল্পীর নাচ দেখেছে, সে নাচের আবেদন বিভিন্ন রিপুকে এড়িয়ে একেবারে মনের অন্তঃস্থলে গিয়ে পৌঁছায়। কিন্তু এ নাচে এতখানি চরণের কৌশল, বেশ বোঝা যায় এটা আয়ত্ত করতে হয়েছে অনেক সাধনা, অনেক অভ্যেসের পর, কিন্তু তবু এ নাচের মধ্যে কোনো শিল্পরস নেই, আছে শুধু ইন্দ্রিয়-সচেতনতার জৈব আবেদন। অবাক হয়ে হঠাৎ অবহিত হোলো কমল, সেও যে খুব উপভোগ করছে, খুব মাথা নাড়ছে নাচের গানের সঙ্গে সঙ্গে। একবার যেন তারিফও করে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে।

কে যেন এসে থালাভরা পান ধরলো কমলের সামনে। কমল তবক মোড়া এক খিলি পান তুলে নিলো। দুলারী হেসে আরেকটি গান ধরলো: অব হাঁ রী ননদিয়া, পান খায় মুখ লাল কিয়ে……।

কমলের মুখ লাল হয়ে উঠলো।

সে ভালো করে তাকিয়ে দেখলো দুলারীবাঈয়ের দিকে। চোখ তার কাজলে কালো, ঠোঁট ভরে অধররাগের লালিমা,—কিন্তু প্রসাধনের এনামেল এখনো কড়া হতে শুরু করেনি, তাই এত তীব্র আলোতেও খুব স্নিগ্ধ দেখাচ্ছে তার মুখ।

তুলারীবাঈ প্রথম থেকেই লক্ষ্য করছিলো কমলকে। মনে মনে খুব হাসছিলো তার বিহ্বলতা দেখে। এতক্ষণ কমল তাকে বার বার দেখছিলো চুরি করে, কিছুতেই তার চোখের উপর চোখ রাখতে পারছিলো না, তার চোখে চোখ পড়তেই কমল চোখ সরিয়ে নিচ্ছিলো। কিন্তু এবার যখন তুলারী দেখলো যে এতক্ষণ পরে কমল তার দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকবার সাহস সঞ্চয় করতে পেরেছে, তুলারীবাঈ তার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে তাকেও তসলিম জানালো, আর দশজনকে যেমনি অভিবাদন জানায় তেমনি।

আর সঙ্গে সঙ্গে কমলের মনের সমস্ত আলো দপ করে নিভে গেল। সে উঠে দাঁড়ালো। থালার উপর রাখলো একটি দশটাকার নোট, তারপর তাড়াতাড়ি বেরিয়ে চলে গেল।

তিনদিন কি চারদিন কমল আসেনি তুলারীর কাছে।

তারপর একদিন এলো।

সুখিয়া তাকে বললো, তুলারীর শরীর ভালো নেই। কমলকে নিয়ে গেল তুলারীর ঘরে।

ঘরের ভিতর খাটের উপর একলা শুয়েছিলো তুলারী। আর কেউ ছিলো না। তাকে বসতে বললো।

চেয়ার ছিলো না একটিও। তুলারীর খাটের একপাশেই বসতে হোলো কমলকে।

তুলারী চোখ বুঁজে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর চোখ খুলে আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে তাকালো কমলের দিকে। কোনো কথা বললো না। চুপচাপ তাকিয়ে রইলো।

কমল :বললো, "তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে? জ্বর হয়েছে বুঝি?"

মাথা নাড়লো তুলারী।

"তা হলে এত বেলা অবধি শুয়ে আছো কেন ?"

"এমনি।"

আরো কিছুক্ষণ চুপচাপ কেটে গেল। কমল আর কি বলবে ভেবে পেলো না। তুলারী কিছু বললোই না।

অনেকক্ষণ পরে কমল বললো, "আমি এবার যাই। কয়েকদিন পরে আসবো।"

"এখনই যাবেন না, আরেকটু বসুন", ভারী গলায় তুলারী বললো।

"বসে কি করবো," কমলের যেন একটুখানি অভিমান হোলো, "তুমিও কোনো কথা বলছো না, আমাকেও চুপ করে থাকতে হচ্ছে।"

ম্লান হাসি হাসলো তুলারী, তারপর আস্তে আস্তে বালিশের তলা থেকে একটি দশটাকার নোট বার করলো।

কমল বুঝতে পারলো হয়তো, তার কান ছুটো লাল হয়ে গেল। একটু যেন ঘেমে উঠলো সে।

তুলারী খুব নরম গলায় বললো, "সেদিন থালার উপরে আপনি এটা রেখে গিয়েছিলেন। তার চেয়ে বরং যদি পায়ের জুতো খুলে মারতেন তাহলেও আমার এত মনে লাগতো না।"

কমল কোনো উত্তর দিতে পারলো না।

তুলারী অপেক্ষা করলো কয়েক মিনিট। তারপর উদ্বেল গলায় বলে উঠলো, "চুপ করে আছেন কেন ? যা হোক একটা কিছু বলুন।"

"আমার কি দোষ ?" কমল জিজ্ঞেস করলো।

তুলারী তার সমুদ্রের মতো চোখ তুটি মেলে কমলের দিকে তাকিয়ে রইলো কোনো উত্তর না দিয়ে।

কমল বলে গেল, "তুমি আর দশজনের মতো হেসে তসলীম জানিয়েছিলে—।"

তুলারীর চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো। কি যেন বলতে গেল সে। তার ঠোঁট দুটো নড়ে উঠলো। কিন্তু চেপে গেল। কিছু বললো না। চুপ করে রইলো। .

কমলও চুপ করে বসে রইলো।

অনেকক্ষণ পরে তুলারী বললো, "আমার ভালো লাগছে না।"

কমল কোনো উত্তর দিলো না।

"এখানে আমার ভালো লাগছে না," বললো তুলারী।

কমল চুপ করে রইলো।

"আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলুন," বলে গেল তুলারী, "এখানে আমার একটুও ভালো লাগছে না।"

কমল জানলা দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলো। সেখানে এক টুকরো হাল্কা মেঘের পাশ দিয়ে এক ঝাঁক পাখি উড়ে চলে গেল।

তুলারী চট করে বিছানার উপর উঠে বসলো। আগুন হয়ে বললো, "কথার উত্তর দিচ্ছো না কেন? তুমি—তুমি কি কিছুই বোঝো না?"

কমল জানলা থেকে মুখ ফিরিয়ে তুলারীর দিকে তাকালো।

তুলারী কমলের চোখে চোখ রেখে বললো, "জানো, সিংদেওজী মাকে কি বলেছে? বলেছে, আমার নাকে নাকি নথ আর মানাচ্ছে না।'"

কমলের বুকের স্পন্দন দ্রুততর হোলো। তবু সে চুপচাপ তাকিয়েই রইলো তুলারীর দিকে, মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলো না।

তুলারী বলে গেল, "তুমি বলো, মানাচ্ছে না আমার নাকে এই নথ? তুমি যদ্দিন বলবে মানাচ্ছে, তদ্দিন আমি এই নথ খুলবো না। তুমি যেদিন বলবে—মানাচ্ছে না, সেদিন আমি এটা খুলে ফেলবো।"

কমলের চোখ দুটি স্নিগ্ধ হয়ে এলো। খুব শান্ত গলায় বললো, "দুলারী, আমি বলতে এসেছিলাম, আমি আর আসবো না।"

"কেন ?" দুলারী ধরা গলায় জিজ্ঞেস করলো।

দুজন দুজনের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে রইলো।

"কেন ? কেন আসবে না," আবার বলে উঠলো দুলারী, "বলো, আমায় বলো কেন আসবে না।"—বলতে বলতে থেমে গেল হঠাৎ। কি জানি কি দেখলো সেই চোখে, গলা নামিয়ে একেবারে অস্ফুট কণ্ঠে বললো, "না, না, বোলো না, কিচ্ছু বোলো না। তুমি যাও।"

কমল চুপ করে বসেই রইলো।

"তোমার পায়ে পড়ি, তুমি যাও," আবার বললো দুলারী।

কোনো কথা না বলে কমল উঠে দাঁড়ালো।

মুখ ফিরিয়ে নিলো দুলারী।

কমল আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

সে যতক্ষণ না চলে গেল, ততক্ষণ চোখ শুকনো রাখলো দুলারী।

কমলের সঙ্গে আর দেখা হয়নি।

যদি সে কয়েকদিন পরে আবার আসতো, দেখতে পেতো দুলারী-বাঈয়ের নাকে নথ আর নেই।

প্রত্যেকদিন তার গান শুনতে আসছে আচকান পরা সিংদেওজী, সেই কোথাকার যেন রাজপরিবারের ছেলে, যার সম্বন্ধে দুলারীর মা ফিরোজাবাঈ খুব উৎফুল্ল হয়ে বলে, এ খুব রইস লোক, এমনটা দেখা যায় না আজকাল।

চোখ বুঁজে চুপচাপ সে-সব পুরোনো কথা ভাবছিলো।

বৃন্দা খানিকক্ষণ মাথা টিপে দিলো, তারপর গায়ে হাত দিয়ে শরীরের তাপ অনুভব করে বললো, "মনে হচ্ছে যেন একটু জ্বর হয়েছে। এবেলা রুটি খেয়ে কাজ নেই। বার্লি করে দি, কেমন?"

"না, বার্লি নয়। স্যুপ করে দে," বললো দুলারীবাঈ।

বৃন্দা উঠে চলে গেল।

দুলারীবাঈ আস্তে আস্তে উঠে বসলো খাটের উপর। খাটের বাজুতে বালিশ রেখে তাতে হেলান দিয়ে বসলো।

দূরের কোনো এক বাড়িতে হারমোনিয়াম বাজছে। হাল্কা চটুল সুরের বাংলা গান গলায় তুলবার চেষ্টা করছে এক সাদা-মাটা গলা।

নিজের মনে একটু হাসলো দুলারীবাঈ।

এ ছিলো তার রেওয়াজ করবার সময়। কতো মেহনত করে গান শিখেছিলো সে। তার গলায় ঠুমরি, গজল, টপ্পা শুনলে সবাই বলতো এই মেয়ে একদিন তার মা ফিরোজাবাঈয়ের চাইতেও বেশী নাম করবে।

মাথার পেছনে হাত দুটো রেখে পেছন দিকে হেলে পড়ে পুরোনো দিনের একটি গানের কলি গুণ গুণ করে গেল নিজের মনে, তারপর একটু দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো।

গলায় আর সেরকম সুর নেই আগের মতো। টনসিল হয়ে বছর কয়েক আগেই গলাটা খারাপ হয়ে গেছে। আজকাল দুটো তিনটে তান দিলেই আর দম থাকে না, কিন্তু এককালে একনাগাড়ে তিন-চার ঘণ্টা নেচে গেয়েও দুলারীবাঈয়ের কোনো থকাওয়াট হোতো না। ভিড় লেগে থাকতো তার বাড়িতে খোলা-মুজরায়,

সেই প্রথম বছরেই এক এক রাত্তিরে দুশো তিনশো টাকা আসতে লাগলো। প্রথম দিকে বছরখানেক বাইরে কোনোদিন একা বীড়া-য় যায়নি দুলারীবাঈ। যেখানেই গেছে মায়ের সঙ্গেই গেছে। গানে সে ফিরোজাবাঈয়ের ধারে-কাছে যেতো না সে-সময়, তবু যেদিন থেকে ফিরোজাবাঈ তাকে সঙ্গে নিয়ে মুজরা করতে যেতে শুরু করলো, সেদিন থেকে তাদের চাহিদা যেন আরো বেড়ে গেল। কোথাও কোনো মাইফিল হওয়ার কথা সবার আগে বীড়ার আমন্ত্রণ আসতো তাদের কাছে, মায়ের গান আর হাজারীপ্রসাদজীর তবলার সঙ্গে তার নাচ যে নেশা ধরিয়ে দিতো গুণগ্রাহীদের মনে, তার কাছে যেন কড়া হুইস্কির নেশাও নিতান্ত জোলো মনে হোতো।

দিনের পর দিন কেটে যেতো চৌরঙ্গির যানবাহন চলা-চলের মতো।

সিংদেওজী আসতো। কখনো সঙ্গে আসতো তার বন্ধুবান্ধবেরা। কখনো সে একা আসতো।

কমলের কথা মাঝে মাঝে মনে পড়তো সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠলে। চোখ খুলে জানলার বাইরে পাখির ডাক শুনলে হঠাৎ কেমন যেন মনে হোতো আজো সেই অল্প বয়েসের দিন, সে বড়ো হয়নি, বড়ো হওয়ার সময় হয়নি। তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠতে হবে, তাকে পড়াতে আসবে সেই ছেলেমানুষ-দেখতে কমল মাস্টার।

তারপর রোদ্দুর উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হোতো, না, বয়েসটা বেড়ে গেছে, শরীরের বয়সের অনুপাতে অনেক বেশী বেড়ে গেছে মনের বয়েস।

কমল আর আসবে না। কমল ওই পূবের এক টুকরো মেঘের মতো, যতোক্ষণ রোদ ওঠেনি, ততক্ষণ বেশ গোলাপী ছিলো, রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রঙ হারিয়ে অনেক দূরে ভেসে চলে গেছে।

সে সময়টা ছিলো উনিশশো পঁয়ত্রিশ কি ছত্রিশ সাল, শৌখিন অসামাজিকতার স্বর্ণযুগ। জিনিসপত্তরের দাম অসম্ভব সস্তা, সাধারণ লোকের হাতে পয়সা নেই। কারো পকেটে যদি পাঁচ টাকা থাকে তো সে কাপ্তেন। বারো আনা করে এক বোতল জাপানী সাকুরা বীয়ার, বিলিতী বীয়ার আরো ছ আনা বেশী। এক বোতল জনি ওয়াকার সাড়ে দশ-টাকায় পাওয়া যায়। আহা! কী দিন ছিলো তখন। পয়সা খরচ করবার মতো শরীফ মেজাজ যাদের, তাদের হাতে ওড়ানোর মতো প্রচুর পয়সাও ছিলো,—জমিদারীর পয়সা, কলকাতার বাড়ি ভাড়ার পয়সা, সামন্ততান্ত্রিক জীবনযাত্রার নিস্করুণ রোজগারের ভাবনাবিহীন পয়সা।

জীবন তখন কথক নাচের পদ-ছন্দের মতো উদ্দাম। এক দিনের জন্যেও ছুটি নেই, ফুরসত নেই, বিশ্রাম নেই, অবকাশ নেই।

একদিন কলকাতায় তো দু-দিন কলকাতার বাইরে, এক রাত নিজের বাড়ির খোলা-মুজরায় তো তিন-রাত সব রইস লোকদের বাগানবাড়িতে, বজরায়, বিলাস প্রাসাদে।

তার মা ফিরোজাবাঈয়ের মনে এক নতুন ভাবনাবিহীন প্রশান্তি,—বুড়ো বয়েসের জন্যে আর কোন উদ্বিগ্নতা রইলো না। দরদস্তুরী নিয়ে মাথা ঘামাতো না দুলারীবাঈ, সে সব তার মায়ের দায়িত্ব। রোজগার হোতো যথেষ্ট, যতো না আসতো মুজরা করতে যাওয়ার বাঁড়ার টাকা, তার চাইতেও অনেক অনেক বেশী পেলা পেতো।

কতো টাকা আমদানী হোতো তার কোনো হিসেব রাখতো না দুলারীবাঈ। সেই প্রথম জীবনে টাকার উপর কোনো আসক্তি তার ছিলো না। হ্যাঁ, গয়না পরতে ভালো লাগতো, দামী দামী শাড়ি পরতে ভালো লাগতো, কিন্তু সে-সব জোগানোর ভার তার মায়ের। তার এ জীবন ভালো লাগতো শুধু এ জন্যে যে এ একটা

উগ্র নেশার মতো, এর মধ্যে ভুলে যেতে পারতো নিজেকে, ভুলে যেতে পারতো নিজের অনেক অসম্ভব আশা ও কামনা, অনেক অম্ল-মধুর বেদনা। ভালো লাগতো নানারকম লোকের সঙ্গে ক্ষণিকের চেনাশোনা। তাদের কার কার চিত্তের কতোখানি কি ভাবে ভরে দিতে হবে সে-সম্বন্ধে তার মায়ের অভিজ্ঞ নির্দেশ সে সহজ ভাবেই মেনে নিতো।

মায়ের শুধু একটি কথা সে শুনতো না। মাঝে মাঝে ফিরোজাবাঈ তাকে নাকে নথ পরতে বলতো মফস্বলের জমিদার-বাড়িতে ডাক পড়লে।

কিন্তু দুলারীবাঈ কোনোদিন রাজী হয়নি।

কমলের কথা ভাবতে ইচ্ছে করতো না। তবু সকালবেলা ঘুম ভেঙে জানলার কাছে দাঁড়ালে তার কথা মনে পড়তো এক এক সময়। আগের দিনগুলোতে এ সময়ের আরেকটু পরে কমলের আসবার সময় হোতো।

এখন সে কোথায়?—নিজের মনে ভাবতো দুলারীবাঈ।

কি করছে এখন?

বই খুলে পড়াশুনো করছে হয়তো।

কিংবা হয়তো থলি হাতে বাজারে গেছে, যেমনি করে লুঙ্গি পরে, গায়ে আধ-ময়লা বোতাম-খোলা শার্ট ঝুলিয়ে বাজারে যায় বড়ো রাস্তার ওপারের গলির মধ্যবিত্ত বাবুরা। অনেকদূরের ফ্ল্যাট-বাড়ির জানলাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতো দুলারীবাঈ।······

······চান সেরে এসে বারান্দায় তোয়ালে শুকোতে দিচ্ছে এক অল্পবয়েসী বাবু। ঘরের ভিতর তার বৌ তাড়াতাড়ি জামায় বোতাম সেলাই করে দিচ্ছে।

······অফিসের বেলা হয়ে এসেছে।

······তাকাতে তাকাতে চোখ পড়তো আরেকটি ঝাপসা বারান্দার দিকে। বাবু বাড়ি থেকে নেমে এসে অফিসের পথ ধরেছে। চেহারা যেন অনেকটা কমলের মতো।

······বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে তার বৌ। ঢলঢলে মুখ, পরনে লালপাড় শাড়ি, এলো চুল, মাথার উপর থেকে ঘোমটাখানি খসে পড়েছে।

······ও কি! ওর নাকে নথুন কেন? নথুন পরে নাকি বাঙালী গেরস্তঘরের মেয়েরা?

······না, ওই মেয়েটি পরে, কারণ সে আগেও পরতো।

······দেখলে কে ভাবতে পারবে—তুলারীবাঈ ভাবতো নিজের মনে—ওই যে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আনমনে তার স্বামীর অফিস-যাওয়া দেখছে এক গেরস্তঘরের বৌ, দেখলে কে ভাবতে পারবে যে সেই বৌটি গেরস্তঘরের মেয়ে নয়, সে শহরের নামকরা বাঈজী ফিরোজাবাঈয়ের মেয়ে, যার নাম তুলারী।······

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ নিজের কল্পনার রাশ টেনে নিজেকে সামলে নিয়ে নিজের মনে হেসে ফেলতো তুলারীবাঈ, আয়নার সামনে এসে রাঙা-পাড় টার্কিশ টাওয়েলে ঘোমটার মতো করে মুখ ঢেকে নিজের মুখের দিকে তাকাতো, খুব সরল খুব বোকা-বোকা খুব স্নিগ্ধ গেরস্ত-ঘরের বৌ-বৌ-চাউনি ফোটাতো নিজের স্বভাব-চপল কালো হরিণ চোখে, একটু বাঁকা হাসি হাসতো নিজের মনে, তারপর আস্তে আস্তে কখন যেন তার হাসিটি করুণ হয়ে আসতো।

তখন তাড়াতাড়ি ফিরে দাঁড়িয়ে ডাকতো তার নবনিযুক্তা সুন্দরী পরিচারিকা জানকীকে।

"হাজারীপ্রসাদজী এসেছে।"

"হ্যাঁ, অনেকক্ষণ।"

"বসতে বলো। সিঙ্গার করে আমি আসছি।"

ঘাগরার উপর ওড়না জড়িয়ে বাইরের ঘরে এসে বসতো তুলারীবাঈ।

সকালবেলা চাকরটা সব ঝাড় পোঁছ করে দিয়েছে যদিও, ঘর ভরে তখনো বাসি ফুলের গন্ধ।

তাকিয়াগুলো ঠিকমতো সাজিয়ে-রাখা পুরু গদিটার দিকে তাকাতে পারতো না ঢুলারীবাঈ, আস্তে আস্তে মাটির উপর বসে হারমোনিয়ামটা কাছে টেনে নিতো, দৈনন্দিন রেওয়াজের মধ্যে ডুবিয়ে দিতো নিজের মনকে।

কমলের কথা আর মনে থাকতো না।

দুপুরবেলা এক-একদিন ঘুম পেতো না কিছুতেই।

শরৎবাবুর বাংলা উপন্যাস নয়তো বা হিন্দী জাসুসী কহানী পড়তে পড়তে বেলা পড়ে আসতো। কোনো কোনোদিন ঢাকাই শাড়ি পরে, পায়ে আলতা পরে, বাঙালী ঘরের মেয়েদের মতো সেজে জানকীকে সঙ্গে নিয়ে কমলালয়ে গিয়ে এটা-ওটা-সেটা কিনে আনতো। মাঝে মাঝে চৌকা-তে গিয়ে নিজেই খাবার তৈরী করতে বসতো ছোট বোন রোশনীর জন্যে।

রোশনীর তখন নয়-দশ বছর বয়েস হয়েছে। ফিরোজাবাঈয়ের আপত্তি সত্ত্বেও সিংদেওজীকে ধরে রোশনীকে একটি নামকরা কন্‌ভেণ্টে ভর্তি করিয়ে দিয়েছে। সেখানে বেশির ভাগ ছাত্রী ফিরিঙ্গী। রোশনী কার মেয়ে তা নিয়ে ভাববার প্রয়োজন কারোই হয় না।

ফিরোজাবাঈ মাঝে মাঝে বলতো, "এবারে রোশনী তালিম নিক কোনো ওস্তাদের কাছে।"

"এত তাড়া কিসের? ও এখনো খুব ছোটো। পরে দেখা যাবে," বলে ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা করতো ঢুলারীবাঈ। কেন ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা করতো বুঝতে পারতো না।

গান শেখা আর গান গাওয়া ছাড়া আর কি করবার আছে

বাঈজীর মেয়ের। ওরা বেনারসের খানদানী বাঈজী, জাতে গন্ধর্ব। ওই তো তাদের পুস্তানী পেশা।

তুলারীবাঈয়ের তবু যেন কিছুতেই ইচ্ছে করতো না নিজের বোন রোশনীকে গান শিখতে দিতে।

মাঝে মাঝে সন্ধ্যের পর আসতো সিংদেওজী। প্রথম দিকে দোস্ত মোসায়েবদের নিয়ে আসতো। পরে পরে একাই আসতো।

দোস্ত-মোসায়েবদের যখন নিয়ে আসতো, তখন বেশ ভালোই লাগতো তুলারীবাঈয়ের। সবাই মিলে খুব হৈ-চৈ ফুর্তি, সারা সন্ধ্যা বেশ কেটে যেতো গান শুনিয়ে, নেচে, পান বিলিয়ে। মুজরা শুনতে অন্য যারা যারা আসতো তাদের সঙ্গে সম্পর্ক শুধু পয়সা নিয়ে গান শোনানোর, কিন্তু এদের সঙ্গে একটা অন্যরকম অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিলো। সিংদেওজীর তুজন খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলো, একজন শেঠ বুলাকীপ্রসাদ, অন্যজন লালাবাবুদের ছোটো তরফের নতুনবাবু শিবশঙ্কর। সন্ধ্যের পর মদের আসর না জমালে বুলাকীপ্রসাদের চলে না। কিন্তু তার বাড়িতে খুব কড়াকড়ি। সেখানে ওসব চলবে না। সুতরাং তুলারীবাঈয়ের বাড়িতেই সে হাজিরা দিতে শুরু করলো সিংদেওজী আর শিবশঙ্করের সঙ্গে। গানের খুব সমঝদার সে-নয় তবে নেশার ঘোর লাগলে গজল শুনতে তার ভালো লাগে, ঘুঙুরের তালে তালে তার নেশা আরো বেশী জমে ওঠে। ব্যস, এই যে নেশা জমে ওঠা, এর বেশী কিছু সে চায় না। তুলারী-বাঈ আর তার সঙ্গিনী আয়েশাবাঈ এরা তুজনে যে নেচে-গেয়ে তার মদের নেশাটা খুব জমিয়ে দেয়, এর জন্যেই সে অত্যন্ত বাধিত তাদের কাছে।

সারাদিনের কাজের শেষে সন্ধ্যেবেলা এই যে একটুখানি অবসর বিনোদন মনকে হাল্কা করে নেওয়ার জন্যে, শরীরকে সতেজ

করে নেওয়া পরের দিনের নানা কাজের মেহেনতের জন্যে, এর চাইতে বেশী কিছু তার প্রয়োজনও নেই। বাড়িতে বৌ আছে, সেই বৌয়ের ভালোবাসাই তার পক্ষে যথেষ্ট, খুব ভালো মেয়ে তার বৌ, খুব ভালোবাসে তাকে, আর সেও খুব ভালোবাসে তার বৌ-কে, বৌ-কে ছাড়া অন্য কাউকে সে কোনোদিন প্যার করতে পারবে না—এসব কথা হুইস্কির ঘোরে সে বহুদিন শুনিয়েছে তুলারীবাঈকে, সিংদেওজীকে, শিবশঙ্করকে।

"তাহলে এখানে আসেন কেন," জিজ্ঞেস করেছিলো শিবশঙ্কর।

"আসি একটু হৈ-চৈ ফুর্তি করবার জন্যে," উত্তর দিয়েছিলো বুলাকীপ্রসাদ, "এত হাসি, এত হাল্কা গল্প, এত গান, এত শরাব—এসব তো বাড়িতে চলবে না। বাড়িতে শুধু সংসারের এই ঝঞ্ঝাট, ওই ঝামেলা, একে নিয়ে এই কথা, ওকে নিয়ে ওই কথা,—ওসব কি ভালো লাগে সারাদিন অতো মেহেনত করবার পর?"

শিবশঙ্করবাবু কিন্তু অন্য ধরনের লোক। এদের সঙ্গে বসে মদ খেতে, গান শুনতে তার ভালো লাগে বটে, কিন্তু তার আসল উদ্দেশ্য অন্য। ওরা এককালে খুব বড়লোক ছিলো সত্যি, কিন্তু এখন অবস্থা পড়ে গেছে। সে আছে একটা ব্যবসা করবার তালে, কিন্তু নিজের কাছে বেশী টাকা নেই। চেষ্টায় আছে, যদি সিংদেওজী আর বুলাকীপ্রসাদের কাছ থেকে টাকা বার করা যায়। সেজন্যেই ওদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে, বেশির ভাগ সময় নিজেই টাকা খরচা করতে চায়, যদিও সিংদেওজী ওকে খরচা করতে দেয় না বড়ো একটা। শিবশঙ্করের স্বভাবও যে খুব ভালো তা নয়, মাঝে মাঝে একটা কামনাবিহ্বল নজর লাগিয়ে তাকিয়ে থাকে তুলারীবাঈয়ের দিকে, কিন্তু যেদিন টের পেলো যে তুলারীবাঈ সম্বন্ধে তার আগ্রহ সিংদেওজী পছন্দ করছে না, সেদিন থেকে তার সম্বন্ধে একেবারে নিস্পৃহ হয়ে আয়েশাবাঈয়ের উপর অনুরাগ দেখিয়েই পরিতৃপ্ত রইলো।

দুলারীবাঈয়ের বিশেষ কোনো পক্ষপাতিত্ব ছিলো না কারো সম্বন্ধে। কেউ যদি তার উপর বিশেষভাবে অনুরক্ত হয় তাতে তার আপত্তি করবার কিছু নেই। কিন্তু যেদিন লক্ষ্য করলো যে সিংদেওজীর ব্যবহারে, কথাবার্তায়, চোখের চাউনিতে একটা একনিষ্ঠতার প্রত্যাশা, সেদিন থেকে দুলারীবাঈ একটু সচেতন হয়ে উঠলো।

একদিন বুলাকীপ্রসাদ একলা এসেছিলো। গান টান শুনে দুটি একশো টাকার নোট রেখে বললো, "দুলারীবাঈ, আমরা এখানে আর বেশি আসবো না, তাই আজ একলা এসে তোমার গান শুনে গেলাম।"

"কেন, আর আসবেন না কেন?" জিজ্ঞেস করলো দুলারীবাঈ।

বুলাকীপ্রসাদ হাসলো, বললো, "সিংদেওজী আমাকে আর শিবশঙ্করকে নিয়ে আরেকজন বাঈজীর ঘরে বসতে আরম্ভ করেছে আজকাল।"

"সে তাঁর মর্জি, কিন্তু তাই বলে আপনি যদি আসতে চান তো আসবেন না কেন?"

"ও চায় না যে আমি বা শিবশঙ্করবাবু এখানে তোমার কাছে আসি," বুলাকীপ্রসাদ উত্তর দিলো।

দুলারীবাঈ বুঝলো। বুঝে হেসে ফেললো। বললো, "শুধু আপনাদের দুজনের এখানে আসা বন্ধ করিয়ে ওঁর কী লাভ? আরো অনেকেই তো আসেন। ওঁদের আসা বন্ধ করবেন কি করে?"

"আমরা ওর চেনা," বোঝানোর চেষ্টা করলো বুলাকীপ্রসাদ, "এখানে অচেনা লোকের যাওয়া আসা তার সইবে, কিন্তু চেনা লোকের যাওয়া আসা সে বরদাস্ত করতে পারবে না।"

মুখ নিচু করে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলো দুলারীবাঈ। তারপর আস্তে আস্তে বললো, "আপনার বন্ধুকে একটা কথা বুঝিয়ে দেবেন। উনিই আমার কাছে প্রথম এসেছেন। তারপর আপনাদের সঙ্গে করে এনেছেন। আপনারা ওঁর বন্ধু। আপনাদের সঙ্গে আমার

ততোটুকু সম্পর্ক, তার বেশি নয়। আমাদের নিজেদের একটা কায়দা-কান্নুন আছে, সেটা আমাদের মেনে চলতে হয়।—এ কথা আপনার বন্ধুকে জানাবেন, আর আপনি নিজেও মনে রাখবেন সব সময়।"

তুলারীবাঈয়ের শেষ কথাটা বুলাকীপ্রসাদকে যেন চাবুকের আঘাত হানলো। নিজের বৌকে সে যতোই ভালোবাস্থক, মনের যে দুর্বলতার দরুন সে এই ধরনের অনৈতিক পরিবেশের মধ্যে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা করে তার দৈনন্দিন জীবনের রূঢ়তা থেকে, সে দুর্বলতা যে ক্রমশ অন্যান্য দুর্বলতার সৃষ্টি করে, সেটা সে যেদিন টের পেয়েছিলো সেদিন অত্যন্ত নিরুপায় বোধ করেছিলো নিজেকে। ভেবেছিলো সেটা সোজাসুজি প্রকাশ না করে খুব হাল্কা ঠাট্টা তামাশার মধ্যেই নিজের মনকে নিয়ন্ত্রিত করে রাখবে। কিন্তু সিংদেওজীর ঈর্ষাপরায়ণতার উল্লেখ করতে গিয়ে যে পরোক্ষভাবে নিজের অবদমিত কামনা ধরা পড়ে গেল তুলারীবাঈয়ের কাছে, তাতে বুলাকীপ্রসাদের আর লজ্জার অবধি রইলো না।

কোনো কথা না বলে সে মুখ নিচু করে আস্তে আস্তে চলে গেল। তুলারীবাঈও তাকে আর ফিরে ডাকলো না।

তিন চার দিন পরে সিংদেওজী যখন এলো, তুলারীবাঈ হেসে জিজ্ঞেস করলো, "বুলাকীপ্রসাদজী আর শিবশঙ্করজী এলেন না?"

সিংদেওজী উত্তর দিলো, "ওরা এক জায়গায় বেশীদিন আসে না। এখন অন্য একজনের কাছে বসছে। কে জানে, যদি শখ হয় তো এসে পড়বে একদিন।" বলে একটু খোসামোদের সুরে বললো, "তোমায় তো বেশীদিন ভুলে থাকা যায় না।"

তুলারীবাঈ আস্তে আস্তে বললো, "সে কথা সত্যি নয়। আপনি ওদের আর এখানে নিয়ে আসতে চান না। ওরা সেটা বোঝে। তাই ওরা আর আসে না।"

একটু আরক্ত হোলো সিংদেওজী। জিজ্ঞেস করলো, "তোমায় বলেছে বুঝি ?"

"না, কেউ বলেনি।"

"তাহলে তোমার এ কথা মনে হোলো কেন ?"

"আপনার মুখ দেখে।"

"আমার মুখ দেখে কি তুমি শুধু এটুকুই টের পাও," সিংদেওজী জিজ্ঞেস করলো।

"যতোটুকু টের পাওয়া দরকার, ততোটুকু টের পাই।"

সিংদেওজী চুপ করে রইলো।

তুলারীবাঈ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বললো, "কিছু দরকার ছিলো না।"

"কিসের দরকার ছিলো না ?"

"ওদের এখানে আসাটা অপছন্দ করার।

সিংদেওজী আস্তে আস্তে উত্তর দিলো, "আমি যে ওদের এখানে আসাটা অপছন্দ করি তা নয়। আমি শুধু চাই তোমার সঙ্গে একলা থাকতে। যখন আমি এখানে থাকবো, তখন আমার সঙ্গে অন্য কেউ থাকবে এটা আমি চাই না।"

তুলারীবাঈ একটু তাকিয়ে দেখলো সিংদেওজীকে। তারপর হেসে ফেললো। হেসে উত্তর দিলো, "আপনার মর্জি। আমার পেশা গান শোনানো। আমি যখন গান গাইবো, তখন আপনি একাই থাকুন আর ইয়ার-দোস্তদের সঙ্গে থাকুন, আমার পক্ষে একই কথা।"

সেদিন সিংদেওজী আর কিছু বললো না।

পরের বার যেদিন এলো, শুনলো তুলারীবাঈ নেই। কলকাতার বাইরে কোথায় মুজরা করতে গেছে।

শুনে সিংদেওজীর খুব রাগ হোলো। সে জানিয়েই গিয়েছিলো যে এদিন সে আসবে।

খুব রাগ করে চলে গেল। স্থির করেছিলো যে আর আসবে না। কিন্তু সাত দিন পরে আবার এলো।

তখন খোলা মুজরা চলছে বাইরের ঘরে। সিংদেওজী ঘরের ভিতর ঢুকলো না। দাঁড়িয়ে রইলো দরজার বাইরে। গান গাইতে গাইতে দুলারীবাঈ চোখ তুলে একবার তাকালো, পরক্ষণেই আবার চোখ নামিয়ে গান গেয়ে গেল নিজের মনে, যেন বিশেষ কোনো রকম গুরুত্ব দেয়নি সিংদেওজীর উপস্থিতিকে। ঘরের ভিতর কয়েকজন লোক বসেছিলো। ওরাও লক্ষ্য করলো না।

উঠে এলো আয়েশাবাঈ। বাইরে এসে জিজ্ঞেস করলো, "আপনি ভেতরে আসবেন না?"

"না। অতো লোকজনের মধ্যে আমার ভালো লাগে না।"

আয়েশাবাঈ হাসলো। বললো, "আচ্ছা, আপনি আমার সঙ্গে আসুন," বলে সিংদেওজীকে বারান্দার শেষ মাথায় আরেকটি ছোটো ঘরে নিয়ে বসালো। বসিয়ে চলে গেল।

ছোটো ঘরের মাঝখানে একটা নিচু তক্তপোশের উপর খুব পুরু গদি পাতা। তার উপর ঝালর দেওয়া একটি সিল্কের জাজিম বিছানো। একপাশে একটি ছোটো টেবিল, তার উপর একটি বড়ো আয়না। আর কোনো আসবাবপত্র নেই সে-ঘরে। সিংদেওজী তাকিয়া ঠেস দিয়ে চুপ করে বসে রইলো খানিকক্ষণ। ওদিকের ঘর থেকে গান, ঘুঙুরের আওয়াজ আর থেকে থেকে প্রশংসার গুঞ্জন ভেসে আসছে। বসে বসে শুনলো সিংদেওজী।

একটু পরে গান থামলো।—কিছুক্ষণ কারো সাড়া শব্দ নেই।

তারপর দুলারীবাঈ এসে বড়ো বড়ো কাচের পুঁতির পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকলো। ঘর ভরে গেল একটি বিলিতী পুষ্প-নির্যাসের গন্ধে। দুলারীবাঈ তক্তপোশের একপাশে বসলো। হাসিমুখে তাকালো

সিংদেওজীর দিকে। কিন্তু সিংদেওজী গম্ভীর মুখে চুপ করে বসে রইলো।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলো তুলারীবাঈ। তারপর হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো, "আমার সঙ্গে কথা বলবেন না বুঝি ?"

সিংদেওজী একটু চুপ করে রইলো। তারপর বললো, "ভেবেছিলাম আসবোই না।"

"তা হলে এলেন কেন ?" তুলারীবাঈ জিজ্ঞেস করলো।

"আমার যেদিন আসবার কথা, সেদিন যদি অন্য কোথাও চলে যাও, বা সেদিন যদি এখানে অন্য লোক থাকে, তাহলে যে আমি আর আসবো না, সেকথা জানিয়ে দিতেই এলাম।"

তুলারী হাসিমুখে চুপ করে শুনলো, কোনো উত্তর দিলো না।

সিংদেওজী জিজ্ঞেস করলো, "সেদিন বাইরে মুজরা করতে গিয়েছিলে কেন ?"

"মা সঙ্গে যেতে বললো, তাই গেলাম," তুলারীবাঈ উত্তর দিলো।

"ফিরোজাবাঈ তো জানতো আমি আসবো। কেন নিয়ে গেল তোমায় ?"

"কি করে বলবো ? আমি তো মা-কে জিজ্ঞেস করিনি," বললো তুলারীবাঈ, "বোধ হয় ওরা অনেক টাকা দিয়েছিলো তাই।"

"আমি টাকা দিই না ?"

"টাকা আমাদের সবাই দেয়," উত্তর দিলো তুলারীবাঈ।

সিংদেওজীর কান দুটো লাল হয়ে গেল।

"আপনি ওঘরে ঢুকলেন না কেন ?" তুলারীবাঈ জিজ্ঞেস করলো।

"ওখানে অন্য লোক ছিলো।"

"তাতে কি ? এ তো খোলা মুজরা হচ্ছিলো।"

"হোক গে। অন্য লোকের মধ্যে আমার ভালো লাগে না।"

"আজ আর গান শুনবেন না," জিজ্ঞেস করলো তুলারীবাঈ।

"এত লোকের মধ্যে নয়," সিংদেওজী উত্তর দিলো, "ওদের চলে যেতে বলো।"

"বাঃ রে, ওঁরা এসে বসেছেন, আমি কি করে উঠিয়ে দিই ওদের ?"

"তা হলে আমি চলে যাচ্ছি।"

"যদি থাকতে না চান," বললো দুলারীবাঈ, "আমি তো আর আপনাকে আটকাতে পারবো না।"

সিংদেওজী কোনো কথা না বলে উঠে পড়লো। বেরিয়ে এলো বাইরের বারান্দায়। দুলারীবাঈও এলো পেছন পেছন। বারান্দা পেরিয়ে বড়ো ঘরটির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সিংদেওজী হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো।

ঘর ফাঁকা। লোকজন সব চলে গেছে।

ফিরে দাঁড়িয়ে দুলারীবাঈয়ের দিকে তাকালো সিংদেওজী। দেখলো মুখে আঁচল চাপা দিয়ে দুলারী খুক-খুক করে হাসছে।

সিংদেওজী আস্তে আস্তে জুতো খুলে রেখে ঘরের ভিতর ঢুকলো।

প্রায়ই আসতো সিংদেওজী, প্রত্যেকদিন না হলেও একদিন দুদিন অন্তর নিশ্চয়ই আসতো। কিন্তু দুলারীবাঈয়ের পক্ষে সব সময় শুধু তার একলার জন্যে বসে গান গাওয়া সম্ভব হোতো না।

বলতো, "আমার গান শুনতে আরো দশজন আসে। ওরা এসে যদি আমায় না পায়, বাইরের থেকে ডাক এলে যদি যেতে না পারি, তাহলে একদিন সবাই আসা বন্ধ করবে, ভুলে যাবে আমার কথা। সেদিন আমি কি করবো ?"

"আমি তো আছি," বললো সিংদেওজী।

"শেষ পর্যন্ত না-ও তো থাকতে পারেন।"

"সে অসম্ভব," সিংদেওজী উত্তর দিলো।

"কেন ?"

সিংদেওজী আস্তে আস্তে উত্তর দিলো, এদ্দিনে কি এই সামান্য কথাটিও বোঝোনি ছুলারীবাঈ ? আমি যে তোমায় প্যার করি।"

ছুলারীবাঈ হেসে ফেললো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "আপনার বিবি নেই ?"

"আছে।"

"তা-হলে ?"

সিংদেওজী গম্ভীর হয়ে গেল। বললো, "ওর বেশি কিছু আমায় জিজ্ঞেস কোরো না ছুলারীবাঈ।"

সিংদেওজীর কথা শুনে ছুলারীবাঈও গম্ভীর হয়ে গেল একটুখানি। তারপর বললো, "আমাকে প্যার করে কী ফায়দা, সাহাবজান ? আমরা বাঈজী, মুজরা করাই আমাদের পুস্তানী পেশা। যদি শুধু এ-কথা য়াদ রাখেন যে আপনার কাছে আমিও আর দশজনের মতো একজন, আর আমার কাছেও আপনি আর দশজনের মতো একজন, তাহলে আপনিও সুখে থাকবেন, আমিও সুখে থাকবো।"

অনেকক্ষণ কি যেন ভাবলো সিংদেওজী। তারপর বললো, "ছুলারীবাঈ, তুমি আমার সঙ্গে চলো।"

"কোথায় ?"

"আমার সঙ্গে, আমাদের স্টেটে।"

"কি হবে সেখানে গিয়ে," জিজ্ঞেস করলো ছুলারী।

"তোমায় আমি মাথায় তুলে রাখবো।"

"না, আমি এখানেই বেশ আছি," ছুলারীবাঈ বললো, "আপনারা সবাই শরীফ, মেহেরবান লোক। আপনারা দশজন যে আমার গান শুনে খুশি হন, আমার গরীবখানায় পায়ের ধুলো দেন, তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

সিংদেওজী ভাবলো হয়তো ভাবছে এখানে দশ জায়গায় গান গেয়ে সে যে-টাকা রোজগার করছে, সিংদেওজীর কাছ থেকে ততো টাকা পাওয়া যাবে কিনা তার কোনো স্থিরতা নেই। সে তাড়াতাড়ি তুলারীবাঈকে আশ্বাস দেওয়ার জন্যে বললো, "দেখ তুলারীবাঈ, আমার যা আছ তোমার আমার পক্ষে যথেষ্ট। তোমার কোনোদিন টাকার অভাব হবে না।"

তুলারীবাঈ মনে মনে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো। সত্যি কথা সোজাসুজি বললে সিংদেওজী বুঝবে না। কতটুকু চেনে সে তুলারীবাঈকে? শুধু বললো, "ওভাবে টাকা আমি চাই না। আপনি যতো টাকাই দিন ওতে আমার কুলোবে না, ওভাবে টাকা নিয়ে আমি খুশি হবো না। আমি গান গেয়ে টাকা রোজগার করি, তাতেই আমি খুশি।"

এ কথাও বুঝলো না সিংদেওজী। জিজ্ঞেস করলো একটা সস্তা আদর্শবাদের অর্থহীন ভান করে, "তুলারীবাঈ! জীবনে টাকাই কি সব?"

তুলারী একটু হাসলো, হেসে বললো, "আমি সামান্য মেয়েমানুষ, অতো বড়ো প্রশ্নের উত্তর দেবো এতো ইলম্ নেই। এ প্রশ্ন কোনো পীর বা সাধু-সন্তকে করবেন, ওঁরা বলতে পারবেন।"

ফিরোজাবাঈয়ের কানে গিয়েছিলো যে সিংদেওজী তুলারীকে রাখতে চেয়েছিলো। তুলারীকে বললো, "সিংদেওজী তো লোক ভালো।"

তুলারী বুঝলো ফিরোজাবাঈ কি বলতে চাইছে। কিন্তু কী উত্তর দেবে মাকে! ও আর কিছু বুঝবে না, শুধু সোজাসুজি টাকার কথাই বুঝবে।

তাই সোজাসুজি উত্তরই দিলো তুলারীবাঈ। বললো, "লোক

ভালো, কিন্তু অবস্থা খুব ভালো নয়। যা কিছু দেখা যায় সব উপর উপর। বুলাকীপ্রসাদজী বলছিলো একদিন। ছোটো স্টেটের রাজপরিবারের ছোটা-সে-ছোটা ভায়ের ছোটা-সে-ছোটা লড়কা। যে টাকা মাসোহারা পায় তাতে কুলোয় না। এখন একটা ব্যবসা করবার চেষ্টা করছে।"

"দেখে তো মনে হয় রইস লোক", বললো ফিরোজাবাঈ।

"মাঝে মাঝে আসে, গান শোনে, পয়সা খরচা করে। সে-টুকুর জন্যে ঠিক-ঠিক আছে। তবে সব ছেড়ে দিয়ে তার সঙ্গে গিয়ে থাকবো, ততো ভরসা ওর উপর করা যায় না। দেখা যাক, পরে কি হয়—।"

ফিরোজাবাঈ শুধু এ ধরনের যুক্তিই বোঝে। সুতরাং দুলারী-বাঈয়ের কথা তার মনে ধরলো। সে আর কিছু বললো না।

দুলারীবাঈ কাউকে মনের কথা খুলে বলে না কোনোদিন, তবে মাঝে মাঝে জান্‌কীর সামনে নিজের মনে একতরফা কথা বলে যায়।

তাকেই একদিন বললো, "সিংদেওজী টাকা দিয়ে ভালোবাসা কিনতে চায়, ভালোবাসার অধিকার পেতে চায়। সে কি হয়? আমি বাঈজী, তাই বলে কি মানুষ নই? আর, শুধু ভালোবাসার জন্যে যদি ভালোবাসতে হয়, তা হলে তো কমলবাবুই ছিলো।"

জানকী এসেছিলো কমল চলে যাওয়ার পরে। কমলকে সে দেখেনি। জিজ্ঞেস করলো, "কমলবাবু কে?"

দুলারীবাঈ শুধু বললো, "ছিলো একজন।"

বাঈজীর পরিচারিকা জানকী, বেশি জিজ্ঞেস করলো না। কিন্তু কথাটা ফিরোজাবাঈয়ের কানে তুললো।

শুনে ফিরোজাবাঈ একটু হাসলো। বললো, "ও কিছু নয়। ও রকম হয়।"

সিংদেওজীও আর কোনোদিন কিছু বলেনি।

তিন চার দিন পর পর আসতো। গান শুনতো। শুনে চলে যেতো।

রাত্তিরে এক একদিন যখন খোলা মুজরা হোতো, গান গাইতে গাইতে এক-এক সময় ডুলারীবাঈয়ের মনে হোতো খুব চেনা একজন কে যেন দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। গান বন্ধ না হলেও গানের তন্ময়তা কেটে যেতো। চোখ তুলে তাকাতো বার বার।

সিংদেওজী অনেকদিন লক্ষ্য করেছিলো। একদিন জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কি কারো ইনতেজার করছো ডুলারীবাঈ?"

ডুলারীবাঈ হেসে উত্তর দিলো, "সে তো সব সময়ই করছি, সাহাবজান।"

"কার?"

"যাঁরা আমার মুজরা শুনতে আসেন তাঁদের।"

"কোনো বিশেষ কারো জন্যে কি নয়?" আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করেছিলো সিংদেওজী।

"হ্যাঁ, মাঝে মাঝে তাও করি বইকি—।"

"কার?"

"যিনি কোনোদিনই আসবেন না, তাঁর।"

সিংদেওজী আর কিছু জিজ্ঞেস করলো না। তার মুখ দেখে ডুলারীবাঈ হেসে ফেললো।

চার

বছরখানেক জীবনটা খুব গতানুগতিক ছিলো। সকালবেলা রেওয়াজ, দুপুরে ঘুম, বিকেলে ছোট বোন রোশনীর দেখাশোনা করা, রাত্তিরে মুজরা—কখনো বাড়িতে, কখনো মায়ের সঙ্গে বাইরে।

তাকে ফিরোজাবাঈ কোনোদিন বাইরে নিজের সঙ্গে ছাড়া মুজরা করতে দেয়নি।

তারপর একদিন পরিবর্তন এলো।

ফিরোজাবাঈয়ের শরীরটা খারাপ ছিলো কয়েকদিন থেকে। বাইরের মুজরা বন্ধ। কয়েকটি ভালো ভালো জায়গা থেকে আমন্ত্রণ এসেছিলো। মাফ করতে বলা হয়েছিলো প্রত্যেককে।

একদিন একজন লোক এলো। নিজের পরিচয় দিলো, কোথাকার যেন জমিদার এক চৌধুরীবাবুর সেক্রেটারি সে। তিনি কলকাতায় এসেছেন কয়েকদিনের জন্যে। তাঁর হাবেলিতে মাইফিল হবে। দুলারীবাঈকে তিনি স্মরণ করেছেন।

দুলারীবাঈ জানালো তার মায়ের তবিয়ত ঠিক নেই।

লোকটি বললো, চৌধুরীবাবু শুধু দুলারীবাঈয়ের গান শুনতে চান।

দুলারীবাঈ উত্তর দিলো যে সে ফিরোজাবাঈয়ের সঙ্গে ছাড়া বীড়া-য় যায় না।

লোকটি পরদিন আবার এসে জানালো যে চৌধুরীবাবু ডবল রেট দিতে রাজী আছেন।

দুলারীবাঈ বিনম্র উত্তর দিলো, "বাবু সাহাবের যখন এতই শখ

আমার গান শোনবার জন্যে, তখন মায়ের তবিয়ত ঠিক হয়ে গেলে অর্ধেক রেটে গান শুনিয়ে আসবো। তার আগে রেটের দশগুণ দিলেও নয়।"

তিন চারদিন পরে একদিন সিংদেওজী এলো। সঙ্গে আরেকজন। তুলারীবাঈ একটু অবাক হোলো। কিন্তু কিছু বললো না। সাদর স্বাগত জানালো নবাগতকে। আর খুব বিমুগ্ধ হয়ে দেখলো সিংদেওজীর সঙ্গে যে এসেছে সে বেশ সুন্দর লম্বা চওড়া দেখতে। আশ্চর্য গোলাপী গায়ের রঙ।

তুলারীবাঈয়ের গান সে খুব বিভোর হয়ে শুনলো। তারপর একশো টাকার তিনটে নোট তার সামনে রেখে দিলো।

তুলারীবাঈ একটু অবাক হয়ে তাকালো।

লোকটি আস্তে আস্তে বললো, "সিংদেও আমার খুব বন্ধু। তার কাছে আমি তোমার গানের 'তারিফ শুনেছি। সেদিন তোমার কাছে আমার সেক্রেটারি এসেছিলো। তুমি তো যেতে রাজী হলে না। এ টাকা আমি তোমার জন্যে তুলে রেখেছিলাম। তাই নিজে এসেই তোমায় দিয়ে গেলাম।"

তুলারীবাঈ চৌধুরীবাবুর গেলাসে হুইস্কি ঢেলে দিলো।

এই সম্মান বাঈজী-বাড়িতে সবার জন্যে নয়, শুধু খুব অন্তরঙ্গ কিংবা বিশেষ অভ্যাগতের জন্যে। চৌধুরীবাবু সোডা মিশিয়ে নিলো নিজের হাতে।

তবে কথাবার্তায় মনে হোলো খুব সমঝদার লোক, বললো, "বেশ ভালো গাইতে শিখেছো। তোমার ওস্তাদ কে?"

নিজের নাকে কানে হাত দিয়ে তুলারীবাঈ বললো, "কিছুই শিখিনি। নাড়া বেঁধেছিলাম উস্তাদ মৈনুদ্দীন মিঞার কাছে।"

"মৈনুদ্দীন মিঞা?" চৌধুরীবাবু ভুরু কুঁচকে ভাবলো একটু।

তারপর বললো, "হ্যাঁ, একবার উনি আমাদের বাড়িতে গান গাইতে এসেছিলেন বটে। বেশ গুণী লোক। আচ্ছা, তুমি লছমীপ্রসাদজীর গান শুনেছো ?"

হালে ঠুমরিতে খুব নাম করেছে লছমীপ্রসাদজী। খাঁটি লক্ষ্ণৌয়ী তার ঘরানা।

"হ্যাঁ, নাম শুনেছি, গ্রামোফোন রেকর্ডে ওঁর গান শুনেছি, কিন্তু ওঁর নিজের মুখে শোনবার সৌভাগ্য হয়নি", ছুলারীবাঈ উত্তর দিলো।

"ওঁকে আমার সঙ্গে কলকাতায় নিয়ে এসেছি। পরশু আমার বাড়িতে এক ঘরোয়া মাইফিল হবে। লছমীপ্রসাদ গাইবে। তুমি যদি মেহেরবানী করে আসতে রাজী হও তো সন্ধ্যেবেলা গাড়ি পাঠিয়ে দেবো।"

ছুলারী একটু ভাবলো। তারপর বললো, "শুধু গান শোনবার জন্যে তো বাইরে যাওয়ার আদত আমাদের নেই।"

"তুমি গান গাইতেই যাবে বাঈজী, তোমার যা দস্তুরী আমি লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেবো," বললো চৌধুরীবাবু।

ছুলারীবাঈ আবার একটু ভাবলো। ভেবে বললো, "দেখুন, আমি যদি বাইরে যাই তো মায়ের সঙ্গেই যাই। আজ পর্যন্ত একা যাই নি। যদি যাই তো এই প্রথম।"

চৌধুরীবাবু ইঙ্গিতটা বুঝলো, বললো, "খুব ভালো কথা। এই বিশেষ মেহেরবানী যখন আমার জন্যে করছো, তুমি যা চাইবে, তাই দেবো।"

"পাঁচশো টাকা," বলে নিজের ঔদ্ধত্যে নিজেই অবাক হয়ে গেল ছুলারীবাঈ।

সিংদেওজী এতক্ষণ কোনো কথা না বলে চুপচাপ বসে নিজের মনে একটু একটু করে হুইস্কির গেলাসে চুমুক দিচ্ছিলো। সে এবার চোখ তুলে একবার ছুলারীবাঈয়ের দিকে তাকালো। তারপর তাকালো চৌধুরীবাবুর দিকে।

চৌধুরীবাবু কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো তুলারীবাঈয়ের দিকে। তারপর বললো, একটা বনেদী তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতেই, "হ্যাঁ, তাই পাঠিয়ে দেবো।"

সিংদেওজী চৌধুরীবাবুর সঙ্গেই চলে গেল কিন্তু আবার ফিরে এলো ঘণ্টাখানেক পরে। ফিরে এসে বললো, "তুলারীবাঈ, ইন্দ্রনারায়ণ লোক ভালো নয়।"

"ইন্দ্রনারায়ণ ?" তুলারীবাঈ চোখ কপালে তুললো, "তিনি আবার কে ?"

"আমার বন্ধু, ওই চৌধুরীবাবু।"

"আপনি তো কাউকে সঙ্গে করে আনেন না। এঁকে নিয়ে এলেন কেন ?" তুলারীবাঈ জিজ্ঞেস করলো।

"কার কাছে যেন তোমার গানের খুব প্রশংসা শুনেছিলো। তারপর একদিন হঠাৎ জানতে পারলো আমি এখানে আসি। তখন আমায় এমন ধরে পড়লো যে আমি ওকে নিয়ে না এসে পারলাম না।"

"আপনার খুব বন্ধু বুঝি ?"

"হ্যাঁ, আমরা কলেজে একসঙ্গে পড়তাম," উত্তর দিলো সিংদেওজী, "যা বলছিলাম, হ্যাঁ, ও লোক ভালো নয়।"

সিংদেওজীর কথা শুনে তুলারী হেসে ফেললো।

বললো, "কে ভালো কে মন্দ সে আপনারাই বুঝুন। আমাদের কিছু বনে-বিগড়ায় না। উনি রইস লোক। আমরা শুধু সে-টুকুই বুঝি।"

পরদিন সকালে তুলারী ফিরোজাবাঈকে গিয়ে বললো, "মা, নারঙ্গীপুরের ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর হাবেলিতে মাইফিল। কাল সেখানে মুজরা করতে যাবো। আয়েশাকে নিয়ে যাচ্ছি সঙ্গে।"

"নারঙ্গীপুরের চৌধুরীবাবু?" চোখ তুলে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো ফিরোজাবাঈ।

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু আমার তো তবিয়ত ঠিক নেই।"

"পাঁচশো টাকা দিতে রাজী হোলো। ইনকার করতে পারলাম না।"

ফিরোজাবাঈ আর কোনো কথা না বলে চুপ করে রইলো।

অবাক হয়ে গেল তুলারীবাঈ। ভেবেছিলো মা খুশি হবে। স্পষ্ট অনুভব করতে পারলো ফিরোজাবাঈয়ের ঈর্ষার উত্তাপ।

চুপচাপ মায়ের কাছ থেকে উঠে চলে এলো তুলারীবাঈ।

আসরে বেশি লোকজন ছিলো না। শুধু কয়েকজন বিশিষ্ট অতিথি, সিংদেওজীর মতো কয়েকজন বন্ধু আর লছমীপ্রসাদ।

তুলারীবাঈ একটি ঠুমরি ধরলো, তারপর একটি গজল, তারপর আবার একটি ঠুমরি।

শহরতলির শেষপ্রান্তে তখন প্রথম প্রহরের নিঝুম রাত। ঝিঁঝি ডাকছে চারদিকে, চাঁদ উঁকি মারছে কৃষ্ণচূড়ার আড়াল থেকে। হাস্নেহানার ঝাড়ের চারদিকে একঝাঁক জোনাকি জ্বলছে আর নিভছে।

তুলারীবাঈয়ের গান যখন শেষ হোলো তখন চাঁদ উঠে এসেছে কৃষ্ণচূড়ার মাথার উপর। নিঝুম রাত একেবারে নিথর হয়ে গেছে। হাস্নেহানার ঝাড় থেকে ভেসে আসছে মন-মাতানো গন্ধ।

ঘরের ভিতর প্রত্যেকের হাতের গেলাসে-গেলাসে ছোটো-ছোটো বরফের টুকরোর অতি মৃদু সুরেলা টুং-টাং শব্দ।

গান শুনে সবাই তারিফ করলো, বাহবা জানালো, পেলা ছুঁড়ে দিলো তুলারীর দিকে।

সবচেয়ে বেশি তারিফ করলো লছমীপ্রসাদজী। বললো, "এ রকম ঠুমরি কলকাতায় কেউ গাইতে পারে জানতাম না। এ তো একেবারে আসল বেনারসী ঘরানা।"

"আমরা বেনারসের লোক," তসলিম জানিয়ে উত্তর দিলো দুলারীবাঈ।

এতক্ষণ সে লক্ষ্য করেনি লছমীপ্রসাদকে। এবার তাকিয়ে দেখলো।

অল্প বয়েস। ছাব্বিশ সাতাশের বেশি নয়, কালো চেহারার উপর খুব চিকন-চোখা দেখতে।

লছমীপ্রসাদ বললো, ফিরোজাবাঈয়ের গান আমি শুনেছি। খুব তৈরী গলা। কিন্তু তোমার চাল অনেক ভালো।

দুলারীবাঈ খুব খুশি হোলো মনে মনে। নারঙ্গীপুরের চৌধুরীবাবুর পাঁচশো টাকার চাইতে লছমীপ্রসাদজীর এ দুটো কথার দাম অনেক বেশি।

কিন্তু লছমীপ্রসাদ যখন গান ধরলো, তখন তার মাথাটা আস্তে আস্তে নিচু হয়ে গেল, নিজের গান অনেক ফিকে মনে হোলো লছমীপ্রসাদের গানের কাছে। লছমীপ্রসাদের গান শুনে লক্ষ্ণৌ দিল্লী লাহোর তার কাছে হৃদয় বিকিয়ে দিয়েছে, তার গজলের রেকর্ড শোনা যায় উত্তর-ভারতের শহর-দেহাতের পাড়ায় পাড়ায়। আজ তার সামনে বসে দুলারীবাঈ ভাবলো, কী শিখলাম গত দশ বছর ধরে! কেন আমার এত দম্ভ? নারঙ্গীপুরের চৌধুরীবাবু, সিংদেওজী, এরা কি আমার পায়ে টাকা ঢেলে দেয় শুধু আমার গানের জন্যে?

লছমীপ্রসাদ তখন গাইছে,—গোরী, তেরে নয়না কজর বিন কারে···

মনে হোলো যেন লছমীপ্রসাদের চোখ দুটো তারই উপর।

আজ আর ফিরোজাবাঈয়ের ডানপিটে বাঈজী মেয়ে দুলারী তার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারলো না।

লছমীপ্রসাদের গান শেষ হোলো। আ-হা-হা, ওয়াহ্-ওয়াহ্ করে খুব তারিফ করলো সবাই। ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী নিজের হাতে একটি গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে তার সামনে এগিয়ে দিলো।

আর ত্বলারীবাঈ ওড়নার প্রান্তটা মাথার উপর ভালো করে টেনে দিয়ে শুধু একটা সলজ্জ তসলিম জানালো।

ইন্দ্রনারায়ণ বার বার তাকিয়ে দেখছিলো তুলারীবাইয়ের মুখের দিকে। এবার সে নিজের সেক্রেটারিকে একটু ইশারা করলো।

সেক্রেটারি এসে তুলারীবাঈকে বললো, "আপনি খুব ক্লান্ত। ওপাশের ঘরে একটু আরাম করে নিন। তারপর আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা হবে।"

সেক্রেটারি সায়েব তাকে সঙ্গে করে আরেকটি ঘরে নিয়ে গেল বিশ্রামের জন্যে। ছোট্টো নিরিবিলি ঘর। স্নিগ্ধ নীলাভ আলো জ্বলছে। ঘর জুড়ে গালচে পাতা। এক কোণে একটি ডিভান। পাশে একটি ছোটো টেবিলের উপর নানারকম চাট, একটি স্কচ-হুইস্কির বোতল আর কয়েকটি সোডা।

তুলারীবাঈ ডিভানে গা এলিয়ে দিলো, চোখ বুঁজে রইলো খানিকক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে গেলাসে হুইস্কি ঢাললো।

ওঁদিকের ঘরে লছমীপ্রসাদ একটি গজল ধরেছে।

আস্তে আস্তে তুলারীবাঈয়ের চোখে একটু ঘুম একটু নেশার ঘোর লাগলো। খেয়াল নেই কখন ইন্দ্রনারায়ণ এসে ঘরে ঢুকেছে। সে যখন আরেকটি গেলাসে নিজের জন্যে হুইস্কি ঢাললো তখন তুলারীবাঈ আধ-বোঁজা চোখ তুলে একটু তাকালো। যখন গেলাস হাতে নিয়ে সে তার পাশে এসে বসলো তখনো কিছু বললো না। তারপর সে যখন এক চুমুকে একটি নীট-ডবল গলায় ঢেলে দিয়ে, গেলাস আর ভরবার কোনো ইচ্ছে প্রকাশ না করে, সেটি একপাশে সরিয়ে রেখে তুলারীবাঈয়ের দিকে একটু ঝুঁকে বসলো, তখন তুলারীবাঈ হেসে ফেললো।

বললো, "আপনার খুব মেহেরবানী। লছমীপ্রসাদজীর গান না শুনে আপনি আমার কাছে চলে এসেছেন।"

"লছমীপ্রসাদের গান? ফুঃ," বললো ইন্দ্রনারায়ণ, "সে গান গাইতে জানে নাকি? তোমার কাছে দশ-বিশ বছর শিখতে পারে।"

তুলারীবাঈ হাসলো ইন্দ্রনারায়ণের এই নির্লজ্জ স্তুতিতে। কী ভেবেছে ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী? মানুষের মন ভেজানো এতই সহজ।

তুলারীবাঈয়ের হাসি দেখে ইন্দ্রনারায়ণ খুশী হোলো, সাহস পেলো। বসলো আরেকটু কাছ ঘেঁসে।

তুলারীবাঈ জিজ্ঞেস করলো, "লছমীনারায়ণজী আর গান গাইবে না?"

"না, অনেক রাত হয়ে এসেছে। ও এবার চলে যাবে। কাল ও কলকাতার বাইরে চলে যাচ্ছে। নাগপুরে কনফারেন্স আছে। সকালে গাড়ি।"

কী যেন ভাবলো তুলারীবাঈ। তারপর বললো, "এবার তো আমাকেও যেতে হবে—।"

"তোমাকেও যেতে হবে?" আকাশ থেকে পড়লো ইন্দ্রনারায়ণ, "তুমি আরেকটু বসবে না?"

"আমার মায়ের তবিয়ত খুব খারাপ।"

ইন্দ্রনারায়ণের মুখ কালো হয়ে গেল। আরেকটি নীট পেগ গলাধঃকরণ করলো সে।

তারপর বললো, "হোক গে। আমি তোমায় যেতে দেবো না।" বললো ঠিক বাচ্চা ছেলের মতো আব্দারে-আব্দারে গলায়।

তুলারীবাঈ হেসে উঠলো জলতরঙ্গের মতো। বললো, "আমাকে যেতেই হবে।"

ততক্ষণে ইন্দ্রনারায়ণ তার দিকে আরেকটু ঝুঁকে পড়েছে। তুলারীবাঈ হাত দিয়ে তাকে আস্তে আস্তে ঠেলে সরিয়ে উঠে পড়লো ডিভান থেকে।

ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর গলা দিয়ে এবার অভিজাত চৌধুরী-সুলভ হুকুম বেরোলো, "অন্তত আধঘণ্টা বোসো। তারপর আমার সেক্রেটারি তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসবে। ওইটুকু দেরিতে তোমার মায়ের অসুখ বেড়ে যাবে না।"

দুলারীবাঈ পেশাদারী বাঈজী। নানারকম লোক দেখেছে। সে গ্রাহ্য করলো না এই উদ্ধত অনুজ্ঞা। হাসতে হাসতে বললো, "চৌধুরীজী, যদি আপনার মেহেরবানী হয় তো আবার মিলবো। আজ আমি থাকতে পারবো না। আমায় যেতে হবে।"

সে চলে গেল।

তরুণ বনেদী জমিদার ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর ফর্সা মুখ তখন লাল হয়ে আছে।

তার বন্ধু সিংদেওজী এসে তার কাঁধে হাত রাখলো। একটু হেসে জিজ্ঞেস করলো, "কি রকম লাগলো এই বাঈজীকে ?"

ইন্দ্রনারায়ণ তার আধো-ঢাকা চোখ দুটো রাখলো সিংদেওজীর মুখের উপর। তারপর একটি গেলাসে হুইস্কি ঢেলে সেটি তার হাতে তুলে দিলো, নিজের গ্লাসেও ঢাললো, ঢেলে বললো, "খুব ভালো গায়।"

"সে তো গায়। তা-ছাড়া, এমনি কি রকম লাগলো ?" বলে হুইস্কিতে সোডা মিশিয়ে নিলো সিংদেওজী।

সহজ নিরাসক্ত হবার চেষ্টা করলো ইন্দ্রনারায়ণ। তবু না বলে পারলো না, "এ কি-রকম বাঈজী ? এত সাধলাম, একটু বসলো না।"

সিংদেওজী খুব খুশী হোলো মনে মনে। মনে একটু সহানুভূতিও এলো। বললো, "ইন্দ্রনারায়ণ, তুমি তো আজ প্রথম দেখলে। আমি আজ তিন বছর ধরে দেখছি। ওর মেজাজ বোঝা ভার।"

ইন্দ্রনারায়ণ হাসলো। হেসে উত্তর দিলো, "তুমি ওই একটা দেখেছো, আর আমি অন্তত দুশো দেখেছি। একটু খানদানী

বাঈজীর মেজাজ ওরকম হয়। তা নইলে যে জীবনে একবারের বেশী আমাদের দেখা হবে না। আর, তা না হলে ওদের চলবে কেন? ওকে আমি চিনেছি, কিন্তু আমাকে ও চেনেনি। বেশ, দেখা যাবে।"

সিংদেওজীর ইচ্ছে হোলো নারঙ্গীপুরের ভূস্বামীপুঙ্গবের পশ্চাতভাগে একটি যথাবিহিত পদাঘাত করে। কিন্তু কলেজের খেলার মাঠে যেটা অবলীলাক্রমে সম্ভব হোতো সেটা এই কেতাদুরস্ত পরিবেশে সম্ভব নয় ভেবে নিজেকে সংবরণ করলো।

তুলারীবাঈ একলা ফেরেনি। ফেরার পথে নামিয়ে দেবে বলে লছমীপ্রসাদকেও গাড়িতে তুলে নিলো। কিন্তু পথে আর নামতে দিলো না। সোজা নিয়ে এলো নিজের বাড়িতে।

হুইস্কির নেশার ঘোর লেগেছে লছমীপ্রসাদেরও। সে বিনা প্রতিবাদে তুলারীবাঈয়ের পেছন পেছন উপরে উঠে এলো। উপরে উঠে এসে গদির উপর তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে পড়লো।

জান্কীকে ডাকলো তুলারী।

জান্কী এলো তসতরি ভরা বেলফুলের মালা নিয়ে। সেটি তুলারীবাঈয়ের হাতে দিয়ে মুখ ফিরিয়ে শুধু একবার মাত্র লছমীপ্রসাদের দিকে তাকালো। কোনো প্রশ্ন করলো না। দেরাজ থেকে হুইস্কির বোতল আর দুটো গেলাস বার করে ওদের সামনে রেখে দরজা বাইরে থেকে ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল।

তুলারীবাঈ আস্তে আস্তে দরজার ছিটকিনিটা তুলে দিলো। টেনে দিলো জানলা আর দরজার ভারী পর্দা। ঘরের বড়ো আলোটা নিভিয়ে জ্বালিয়ে দিলো একটি নীল আলো। থালা থেকে বেলফুলের দুটো মালা তুলে নিয়ে একটি কবরীতে আরেকটি হাতে জড়িয়ে নিলো।

তারপর হুইস্কি ঢাললো দুটো গেলাসে। একটুখানি সোডা মিশিয়ে একটি এগিয়ে দিলো লছমীপ্রসাদের দিকে। আরেকটি নিজে তুলে নিয়ে তাতে চুমুক দিলো।

"বড্ড বেশি হয়ে যাবে যে!" ক্লান্ত গলায় বললো লছমীপ্রসাদ, "চৌধুরী সাহেবের ওখানে অনেক খেয়েছি।"

"একদিন না হয় একটু বেশিই হোলো", ভুবনমোহিনী হাসি হেসে বললো দুলারীবাঈ।

লছমীপ্রসাদ আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, "রাত যে অনেক হোলো, বাড়ি ফিরবো কি করে?"

"ফিরবেন না।"

"কি করবো তা-হলে?"

ঘর ভরে তখন রজনীগন্ধার গন্ধ, বেলফুলের স্নিগ্ধ আমেজ।

তাকিয়া ঠেস দিয়ে সামনে ঝুঁকে বসলো দুলারীবাঈ। খুব নিচু গলায় বললো, "আমায় গান শোনাবেন। আমি তো সে-জন্যেই আপনাকে এখানে নিয়ে এলাম। ওই গানটা শুনবো,—গোরী, তেরে নয়না কজ্জর বিন কারে···।"

"গান আমিও শুনবো। তুমি গাইবে," আস্তে আস্তে বললো লছমীপ্রসাদ, "সেই গানটি, যেটি আজ প্রথম গেয়েছিলে,—আজ সখি আয়ী মিলন কী রাত···।"

"তারপর আপনি আর আমি একসঙ্গে গাইবো,—না, না, গাইবো না। আপনার সামনে আমি কী গাইবো?"

"হ্যাঁ গাইবে। আমার সঙ্গে গাইলে ঠিক আমারি মতো গাইবে," বলে লছমীপ্রসাদ আবার হুইস্কি ঢাললো, প্রথমে নিজের গেলাসে, তারপর দুলারীর গেলাসে।

প্রহরের পর প্রহর কেটে গেল। আস্তে আস্তে শেষ হয়ে এলো বোতলের হুইস্কি। কখন যেন গানের পর গান মন্থর হয়ে অস্ফুট হয়ে ধীরে ধীরে শেষ হয়ে এলো।

নিভে গেল ঘরের নীল আলো। পর্দা-সরিয়ে দেওয়া জানলার ওপার থেকে যে একটুখানি চাঁদের ঘুম-ঘুম আলো আসছিলো, তাও বিলীন হয়ে গেল সামনের বাড়ির ছাতের ওপারে।

সকাল বেলা ফিরোজাবাঈ দেখলো বাইরের ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে আসছে তুলারীবাঈ।

তখন বেলা ন-টা। তুলারীবাঈয়ের চোখে তখনো ঘুমজড়িমা। আগের দিন রাত্তিরের বেনারসী শাড়ি আর গয়না তখনো গায়ে আছে। খোঁপা থেকে আলগোছে ঝুলছে বেলফুলের বাসি মালা।

ফিরোজাবাঈ গম্ভীরভাবে তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত তাকিয়ে দেখলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "রাত্তিরে শুতে আসো নি?"

"ও ঘরেই শুয়েছিলাম," বলে তুলারী হাই তুললো। একটু অবাকও হোলো। এসব প্রশ্ন তাদের জীবনে একেবারে অবান্তর।

"কে গান গাইছিলো কাল রাত্তিরে?" ফিরোজাবাঈ জানতে চাইলো।

"লছমীপ্রসাদজী।"

"লছমীপ্রসাদজী? কোন লছমীপ্রসাদজী?"

তুলারীবাঈ হাসলো। বললো, "লছমীপ্রসাদ একজনই আছে, মা।"

ফিরোজা বললো, "আমায় ডাকলে না কেন? ভালো করে শুনতাম ওর গান। ওকে আরেকদিন আসতে বোলো।"

"উনি ওই ঘরে ঘুমোচ্ছেন," তুলারী হেসে বললো।

সেদিন সকালে লছমীপ্রসাদের গাড়ি ধরবার কথা। কলকাতার

বাইরে যাবে সে। কিন্তু যখন তার ঘুম ভাঙলো ততক্ষণে গাড়ির সময় চলে গেছে।

লছমীপ্রসাদ সেদিন যেতে পারলো না, তার পরদিন নয়, তার পরদিনও নয়।—একদিন দু-দিন করতে করতে দেখা গেল দুলারীবাঈ তাকে স্থায়ীভাবে আটকে ফেললো নিজের স্বর্ণপিঞ্জরে।

"কেন?" জিজ্ঞেস করলো লছমীপ্রসাদ, সুরার আমেজে একটু জড়িয়ে জড়িয়ে, "আমায় আটকে রাখছো কেন?"

"আমি গান শিখবো আপনার কাছে," খুব সহজভাবে বললো দুলারীবাঈ।

"ব্যস? শুধু গান শিখবে বলে?"

"হ্যাঁ।"

"শুধু গান শিখবে বলেই? আর কিছু নয়?" দুলারীর দিকে তাকিয়ে নরম গলায় জিজ্ঞেস করলো লছমীপ্রসাদ।

দুলারী একটু হাসলো। বললো, "শুধু গান শিখবো বলেই। আর কিছু নয়।"

মুখ ফিরিয়ে নিলো লছমীপ্রসাদ। জানলা দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবলো। তারপর দেখলো একটি চিল খুব হাল্কা মনে একলা ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশের তেপান্তরে।

দুলারীর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললো, "না, আমি আর থাকবো না। আমি চলে যাবো।"

"বেশ তো যান," মুচকি হেসে উত্তর দিলো দুলারীবাঈ।

"সত্যি আমি থাকবো না।"

"কে বলছে থাকতে?" দুলারী হাসতে লাগলো, "বলছি তো, যদি পারেন তো যান।"

লছমীপ্রসাদ আবার তাকিয়ে রইলো বাইরের আকাশের দিকে, যেখানে ভেসে বেড়াচ্ছে সেই বাঁধনবিহীন বিহঙ্গ।

তুলারীবাঈ সাবান আর তোয়ালে নিয়ে এলো। কোনো কথা না বলে চুপচাপ স্নান করতে চলে গেল লছমীপ্রসাদ।

লছমীপ্রসাদ গান শেখাতে লাগলো তুলারীবাঈকে। বিদায় করে দেওয়া হোলো তার পুরোনো ওস্তাদকে।

দিনগুলো স্বর্গের মতো কাটতে লাগলো। সারাদিন গান গাওয়া আর গান শেখা, সকাল, তুপুর, বিকেল—না, সন্ধ্যে নয়, রাত্তির নয়। তখন তুলারীর মুজরা, তারপর ঘুম—তা নইলে কিছুক্ষণ গল্প করা, তারপর ঘুম।

লছমীপ্রসাদ বাইরে বেরোনো একেবারে ছেড়ে দিলো। তুলারী তাকে কিছুতেই কাছ-ছাড়া হতে দিতো না। নেহাত যদি ময়দানে বা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যালে বেড়াতে যেতে চাইতো, নয়তো বা যদি যেতে চাইতো সিনেমায়, সঙ্গে যেতো তুলারীবাঈ। কোথাও কোনো বন্ধু বা পরিচিতের সঙ্গে যদি দেখা করতে যেতো, ফিরে এসে দেখতো তুলারী খুব অস্থির মনে বসে আছে।

"এত দেরী হোলো কেন?" জিজ্ঞেস করতো তুলারীবাঈ। সত্যি সত্যি দেরী না হলেও জিজ্ঞেস করতো।

লছমীপ্রসাদ কৈফিয়ত একটা না একটা কিছু দিতো। তুলারী আর কিছু জিজ্ঞেস করতো না। কিন্তু মুখ ভার করে বসে থাকতো সারাদিন।

লছমীপ্রসাদের সইতো না এই মুখ ভার করে থাকা। ওকে সাধাসাধি করে কোনো লাভ হোতো না।—সারাদিন তার মুখ ভার। সন্ধ্যের পর মুজরাতে, সে ঘরেই হোক বা বাইরেই হোক, সেই চটুল গান, চপল হাসি, চঞ্চল চোখ, কিন্তু মুজরা শেষ হবার

পর নিজের ঘরে আবার সেই মুখ ভার করে বসে থাকা, একদিন দুদিন তিনদিন। তারপর যদি লছমীপ্রসাদ নিজের মনে একটি নতুন কিছু গাইতে থাকতো, দেখা যেতো দুলারীবাঈ আস্তে আস্তে গলতে শুরু করেছে।

এমনি করে দিনের পর দিন।

লছমীপ্রসাদ শেষ পর্যন্ত একদিন বন্ধু-বান্ধব চেনাশোনাদের সঙ্গেও দেখা করা ছেড়ে দিলো। বাইরে কোথাও গান গাওয়াও ছেড়ে দিলো একেবারে। সারাজীবনের মতো সমস্ত ভাবনার বোঝা, সমস্ত প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্ব যখন আরেকজন নিয়ে নিলো, তখন যেন আর নিজের কোনো আগ্রহ, কোনো জীবনতৃষ্ণা, কোনো বৈচিত্র্যপ্রিয়তা রইলো না। যেই বিরামবিহীন জীবনসংগ্রাম সমস্ত প্রাণীকে প্রগতিশীল বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ঠেলে নিয়ে চলে পরিপূর্ণতার সীমাহীন দিগন্তের লক্ষ্যপথে, সেই জীবনসংগ্রাম যখন লছমীপ্রসাদের জীবন থেকে ঘুচে গেল সে আর কোনো দিকে এগোতে পারলো না, হারিয়ে ফেললো তার জঙ্গমতা, দুলারীবাঈয়ের জীবনের আর্ট-গ্যালারিতে স্থাবর হয়ে পড়ে রইলো সোনালী-ফ্রেমে বাঁধানো প্রতিকৃতি হয়ে।

এমনি করে এক বছর কেটে গেল, দু-বছর কেটে গেল।

তারপর একদিন লছমীপ্রসাদ দেখলো লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, লাহোর তাকে ভুলেই গেছে।

কোথা থেকেও আর কনফারেন্সে বা কোনো আসরে গাইবার আমন্ত্রণ আর আসে না। নতুন রেকর্ড করবার কনট্রাক্ট আসে না। সিনেমার ইণ্টারভ্যালে, চায়ের দোকানে, রেস্তরাঁয়, লোকের বাড়িতে, লছমীপ্রসাদের গজল আর ঠুমরি বাজাতে বেশী শোনা যায় না। সঙ্গীতের আকাশে নতুন নতুন তারা দেখা দিচ্ছে। কোথায় কোন

শুকতারা ঢাকা পড়ে আছে চাঁদের আলোর নিষ্করুণ শুভ্রতার আড়ালে কেউ তার খোঁজ করলো না।

তখন এক অব্যক্ত বিষণ্ণতা নামলো তার চোখ ভরে। সব কাজের মধ্যেই একটা আনমনা ভাব। খাওয়া দাওয়া চলাফেরার মধ্যে একটা খামখেয়ালীপনা। হাসি আর আগের মতো প্রাণখোলা নয়, সে যতোই মনমাতানো হোক, কোথায় যেন অনুভব করা একটুখানি গোপন বেদনার ব্যঞ্জনা।

যতোটা সম্ভব গোপন করবার চেষ্টা করতো লছমীপ্রসাদ। কিন্তু চিরন্তন নারীর সন্ধানী চোখে সেটা ধরা পড়লো। ত্বলারীবাঈ অনুভব করতে পারলো, কিন্তু বিজয়িনী নারীর আত্মকেন্দ্রিকতায় তার মন আচ্ছন্ন, অনুভব করলেও বুঝতে পারলো না।

"কি হয়েছে তোমার, বলো আমায়," বলতো ত্বলারী, "আমায় কি তোমার ভালো লাগছে না? তোমার কি চাই বলো? যা চাই সব নাও, আমার যা আছে, সব কিছু নিয়ে নাও।..."

সব নিয়ে আমি কি করবো,—লছমীপ্রসাদ মনে মনে ভাবতো, —আমার সোনার খাঁচা চাই না, আমার আকাশ আমায় ফিরিয়ে দাও।

"কি হয়েছে তোমার?"

কি হয়েছে কি-করে বোঝাবে লছমীপ্রসাদ। বোঝাতে চাইলেও কি বুঝবে ত্বলারীবাঈ?

শেয়ালদার কাছে এক রেস্তরাঁয় বসে চা খাচ্ছিলো একদিন। এমন সময় গ্রামোফোনে তার রেকর্ড বাজতে লাগলো।

একজন খদ্দের হঠাৎ আরেকজনকে বললে, "কে গাইছে?"

সে বললো, "ওটা প্রফেসার লছমীপ্রসাদের রেকর্ড—।"

"প্রফেসার লছমীপ্রসাদ আজকাল আর গায় না?"

"বোধ হয় গায় না। সেদিন কে যেন বলছিলো ও মদ খেয়ে খেয়ে গলাটা একেবারে নষ্ট করে ফেলেছে।"

বাড়ি ফিরে এসে বলেছিলো তুলারীবাঈকে। তুলারী শুনে প্রথমটা খুব রাগ করেছিলো। ওসব বাজে রেস্তরাঁয় ঢুকতে কে বলেছিলো? ওসব বাজে জায়গায় কেন যায় লছমীপ্রসাদ? দামী দার্জিলিঙের চা আনানো হয় বাড়িতে, যে চা শুধু বিলেতে রপ্তানী হয়, সেই চা বড়ো বড়ো ছুটো কাঠের বাক্স ভরে উপহার দিয়েছে তাদের অনুরক্ত এক চা-বাগানের মালিক, সেই চায়ে লছমীপ্রসাদের মন ভরে না?

হায় মেয়েমানুষ।—ভাবলো লছমীপ্রসাদ। আমি আমার মনের কোন দুঃখু বোঝাতে গেলাম, আর তুমি কোন কথা নিয়ে ঝগড়া শুরু করে দিলে।

লছমীপ্রসাদকে বকতে বকতে তুলারীর দৃষ্টি খুব স্নেহঘন হয়ে গেল তার মুখ দেখে। আস্তে আস্তে বললো, "ওসব বাজে জায়গায় গিয়ে যখন আজেবাজে লোকের আজেবাজে কথা শুনে তোমার কষ্ট হয়, তখন আমার খারাপ লাগে না? সেজন্যেই তো বলছিলাম ওসব জায়গায় চা খেতে যেয়ো না।"

লছমীপ্রসাদ মুখ অন্ধকার করে বসে রইলো।

তুলারী সান্ত্বনা দিয়ে বললো, "তুমি গান গাইতে পারো কি না-পারো সে আমি তো জানি। লোকে কি বলে না-বলে তাতে কি আসে যায়। তুমি আছো, আমি আছি,—ব্যস, তাহলে ছুনিয়া আছে কি নেই, তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।"

লছমীপ্রসাদ চুপ করে রইলো।

"নাও, একটা গান গাও—।"

মাথা নাড়লো লছমীপ্রসাদ।

"কেন?"

"কি হবে গান গেয়ে?"

"কেন ? আমি শুনবো।"

লছমীপ্রসাদ মাথা নাড়লো।

"আচ্ছা আমি একটা গাই ?" হেসে বললো দুলারীবাই।

"কেন ?"

"আমি সেধে যখন তোমার মান ভাঙাতে পারছি না, তখন গান গেয়ে ভাঙাই— ।"

কোনো উত্তর দিলো না লছমীপ্রসাদ।

যে কোনো উপলক্ষের গান মজুদ থাকে বাঈজীদের সঞ্চয়ে। দুলারীবাঈ বাম পা মুড়ে, ডান পা ডাইনে ছড়িয়ে, একটু হেলে বসলো পেশাদারী ভঙ্গিতে। তারপর ডান হাত তুলে তর্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ জুড়ে একটি মুদ্রা করে গান ধরলো :

রন্‌জে ফুরকত কি সিবা
কুছ তুম্‌হে মন্‌জুর ভি হ্যায়
কো অদাবত ভি হ্যায়
ঝিড়কী-ভি-হ্যায়
চল দূর ভি হ্যায়—

মান-ভাঙানোর গান লিখেছিলো এক উর্দু কবি। দুলারীর মুখে সেই গজল শুনে লছমীপ্রসাদের মন দুলে উঠলো।

······আরে আজ তো মিল লে জালিম
রস মে দুনিয়া ভি হ্যায়
মওকা ভি হ্যায়
দস্তুর ভি হ্যায়······

কিছুক্ষণের জন্যে সব দুঃখ, সব ক্ষোভ ভুলে গেল লছমীপ্রসাদ। তার চোখ দুটো হাস্যময় হয়ে উঠলো। তাই দেখে খুশী হোলো দুলারীও।

······ইসলিয়ে ম্যয় আপসে করতা হুঁ
বোসে কা সওআল,

কুছ সকাওত ভি হ্যায়
হিম্মত ভি হ্যায়
মকদূর ভি হ্যায়······

নিরালা দুপুর গড়িয়ে গিয়ে বিকেল হোলো। দুলারীবাঈ উঠে গেল কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিতে। রাত্তিরে বাইরে কোথাও মূজরা আছে।

লছমীপ্রসাদের মনে আবার সন্ধ্যে নামলো।

"আমায় কি তোমার ভালো লাগছে না? তোমার কি চাই বলো। যা চাই সব নাও, আমার যা আছে সব কিছু নিয়ে যাও।"

কি হবে সব কিছু নিয়ে,—লছমীপ্রসাদ ভাবতো,—আমার সোনার খাঁচা চাই না, আমার আকাশ আমায় ফিরিয়ে দাও।

"কি হয়েছে তোমার?"

কি হয়েছে কি করে বোঝাবে লছমীপ্রসাদ। দুলারীবাঈ বুঝতে চাইবে না।

আমেদাবাদে সঙ্গীত সম্মেলন। লছমীপ্রসাদের আমন্ত্রণ এসেছে।

শুনে দুলারীবাঈ মুখ ভার করে রইলো।

"যাবো?"

"যাও না। মানা করছে কে?"

যে ভাবে দুলারীবাঈ বললো তাতে লছমীপ্রসাদের মনের খুশির আলো দপ করে নিভে গেল।

লছমীপ্রসাদ আমেদাবাদ আর গেল না।

সারাদিন মুখ ভার করে রইলো দুলারীবাঈ। লছমীপ্রসাদ তাকে অনেক সাধাসাধি করেও কথা বলাতে পারলো না। তখন নিজের ঘরে গিয়ে একলা বসে গান গাইতে বসলো—জা ম্যয় তোসে নাহি বোঁলু রে সাঁওরিয়া······

কখন দেখে তুলারীবাঈ তার পাশে এসে বসেছে। জলে ভরা চোখ মেলে তার গান শুনছে।

“আমায় কি তোমার ভালো লাগছে না? তোমার কি চাই বলো। যা চাই সব নাও, আমার যা আছে সব কিছু নিয়ে নাও।”

কি হবে সব কিছু নিয়ে,—লছমীপ্রসাদ ভাবতো,—আমার সোনার খাঁচা চাই না, আমাকে আমার আকাশ ফিরিয়ে দাও।

“কি হয়েছে তোমার?”

কি হয়েছে কি করে বোঝাবে লছমীপ্রসাদ। তুলারী বুঝতে চাইবে না।

কিংবা হয়তো বুঝতে পেরেছিলো খানিকটা।

মিউজিক কনফারেন্সে গিয়েছিলো ওরা তুজনে। ভারতের নানা জায়গা থেকে বড়ো বড়ো গুণী ওস্তাদেরা এসেছে। তাদের মধ্যে অনেকে লছমীপ্রসাদের চেনা, তু’চারজন সঙ্গীত জগতে এসেছে লছমীপ্রসাদের অনেক পরে।

শ্রোতাদের মধ্যে তুলারীবাঈয়ের পাশে বসে লছমীপ্রসাদ তাদের গান শুনলো, রসিকদের বাহবা শুনলো, অনুরক্তদের উন্মাদনা দেখলো। আসরের শেষে অপরিচিতদের জনতার স্রোতে ভেসে অপরিচিতের মতো ফিরে চলে এলো লছমীপ্রসাদ।

তখন অনেক রাত। গুম হয়ে বসেছিলো সে। শুতে যায় নি।

তাই হয়তো বুঝতে পেরেছিলো তুলারীবাঈ। সেও ঘুমুতে গেল না। চুপ করে বসে রইলো লছমীপ্রসাদের কাছে।

তখন বাইরে একটু একটু বৃষ্টি নেমেছে।

“তোমায় কেউ নাই বা চিনলো,” বললো তুলারী, “কি আসে যায় তাতে! আমি তো চিনি। ওদের গান শুনে আমার মন ভরে নি। তুমি আমায় গান শোনাও।”

লছমীপ্রসাদ কিছুক্ষণ কোনো উত্তর দিলো না। তারপর একটু হেসে জিজ্ঞেস করলো, "কি গান শোনাবো ?"

"ওই গানটা—অবকে সাওন ঘর আ জা…।"

গান ধরলো লছমীপ্রসাদ। বৃষ্টি আরও প্রবল হয়ে নামলো। গান শেষ হতে দেখে তুলারী কখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

কিন্তু লছমীপ্রসাদের চোখে আর সারারাত ঘুম এলো না।

"আমায় কি তোমার ভালো লাগছে না ? তোমার কি চাই বলো। যা চাই সব নাও। আমার যা আছে সব কিছু নিয়ে নাও।"

কি হবে সব কিছু নিয়ে,—লছমীপ্রসাদ ভাবতো, আমার সোনার খাঁচা চাই না, আমাকে আমার আকাশ ফিরিয়ে দাও।

"কি হয়েছে তোমার ?"

কি হয়েছে কি করে বোঝাবে লছমীপ্রসাদ। তুলারীবাঈ কি বুঝতে চাইবে ?

সেদিন হোলি। সেই উপলক্ষে একটা গানের আসর হচ্ছে ভবানীপুরে। লছমীপ্রসাদজীর ডাক পড়লো সেখানে।

গরম দুধের মতো উথলে উঠলো তুলারীবাঈ। "হোলির দিন সন্ধ্যেবেলা ? বেশ যেতে চাও তো যাও। তবে আমি ভেবেছিলাম এদিন তুমি আমারই সঙ্গে থাকবে।"

সেদিন জমকালো মুজরা তুলারীবাঈয়ের বাড়িতে। ফিরোজাবাঈ নিজেও এসে বসেছে তুলারীবাঈয়ের সঙ্গে। ফিরোজাবাঈয়ের গানের সঙ্গে সঙ্গে মুখর হয়ে উঠেছে তুলারীবাঈয়ের আর আয়েশা-বাঈয়ের নূপুরের বোল। বড়ো বড়ো রইস লোক মুজরা শুনতে আসছে।

তুলারীদের বাড়ির মুজরায় লছমীপ্রসাদজী কোনোদিনই এসে

বসতো না, কিন্তু আজ তুলারীবাঈ তাকে জোর করে নিয়ে এলো। চিকনের কাজ করা, হাত গিলে করা ফিনফিনে পাঞ্জাবি আর পায়জামা পরে চন্দনকাঠের ছোটো লাঠি হাতে আসরে এসে বসলো লছমীপ্রসাদজী।

তুলারীবাঈ তাকে কটাক্ষবিদ্ধ করে শোনালো—জাও, ছৈলওয়া ন মারো ভর পিচকারি······

গান শুনতে শুনতে সবাই পেলা ছুঁড়ে দিচ্ছিলো।

ওরা কতো সুখী,—ভাবলো লছমীপ্রসাদ,—আসে, গান শোনে, টাকা দেয় আর চলে যায়। ঠিক নদীর লহরের মতো। শুধু সে নিজেই লহরের মতো বয়ে বয়ে এসে হঠাৎ এ জায়গায় জলের ঘুর্ণি হয়ে পড়েছে, না পারছে এগোতে, না পারছে পেছন দিকে ফিরে যেতে, শুধু নিজের নিস্ফল গতিতে নিজেই ঘুরে ঘুরে মরছে।

তার পেলা দেওয়ার অধিকার নেই। তুলারীবাঈও নেবে না। গুণীজনের কাছ থেকে কিছু নেওয়ার রেওয়াজ নেই, তাকে সে গুরু মেনেছে।

······ম্যয় তো অবহি রঙায়ী সাড়ি,
ন মারো ভর পিচকারী—

তসলিম জানাতে জানাতে তার দিকে এগিয়ে এলো তুলারীবাঈ আবার পিছু হেঁটে সরে গেল।

হাত নিসপিস করতে লাগলো লছমীপ্রসাদের, আর সবার মতো পেলা ছুঁড়ে দিতে পারলে সেও যেন খুশি হোতো।

"ভাবছি আরেকটি গানের রেকর্ড করবো," লছমীপ্রসাদ একদিন বলেছিলো।

শুনে গম্ভীর হয়ে গেল তুলারীবাঈ।

"তুমি কি চাও না আমার নাম হোক?"

তুলারী আস্তে আস্তে উত্তর দিলো, "আমার ভয় করে।"

"ভয়?" লছমীপ্রসাদ অবাক হোলো।

"তোমার খুব নাম হলে তুমি আমার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে যাবে।"

শুনে লছমীপ্রসাদ একটি দীর্ঘনিশ্বাস চাপলো।

"তুমি গান রেকর্ড করতে চাও করো, কন্‌ফারেন্সে গাইবার জন্যে বাইরে যেতে চাও যাও, আমি মানা করবার কে? আমি শুধু বলছিলাম, আমার ভয় করে। আর—আর, আমি ভাবতাম তোমার গান শুধু আমার একলার জন্যে।"

গান রেকর্ড করবার আশা ত্যাগ করলো লছমীপ্রসাদ।

আরেকদিন খুব খুশী হয়ে তুলারীবাঈয়ের কাছে এসে লছমীপ্রসাদ বললো, "জানো, আশ্চর্য ব্যাপার, বীথিকা দেবী আমার কাছে তালিম নিতে চান।"

"কোন বীথিকা দেবী?"

"কোন বীথিকা আবার? ওই যে বাংলা গান গেয়ে খুব নাম করেছে! এত গানের রেকর্ড, ওকে কে না চেনে? ও আমার কাছে খেয়াল আর ঠুমরি শিখতে চায়। ওকে শেখালে আমার কিরকম নাম হবে একবার ভাবো তো!"

তুলারী মুখ নিচু করে ঠোঁট কামড়ে রইলো কিছুক্ষণ। তবু ঠোঁট কেঁপে উঠলো বার বার। তারপর হঠাৎ মাটিতে বসে পড়ে তার পা তুটো জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললো। বললো, "তোমায় এত বলি, তবু বোঝো না? যেদিন আমি মরে যাবো, সেদিন আমাকে গোর দিয়ে ফিরে এসে তুমি যাকে খুশী গান শিখিও, যেখানে খুশী গান গাইতে যেও, আমি মানা করতে আসবো না।"

এই পরিস্থিতি নিরুপায় হয়ে মেনে নিলো লছমীপ্রসাদ। ফুলের

মালা ভেবে নিজের হাতে যেটা গলায় পরেছিলো, যখন দেখলো সেটি লোহার শেকলের মতো গুরুভার হয়ে পড়েছে, তখন আর তার থেকে নিজেকে মুক্ত করবার শক্তি রইলো না।

সব বুঝেও যেন বুঝতো না ডুলারী। বলতো, কনফারেন্সে গেয়ে কতো টাকা পাবে তুমি, রেকর্ডে গান গেয়ে কতো টাকা পাবে, ছাত্রীকে গান শিখিয়ে কতো টাকা পাবে বলো, কী এমন টাকা? কী দরকার টাকার? ডুলারীর যা টাকা আছে সে টাকা কি লছমীপ্রসাদের নয়।

লছমীপ্রসাদ বিষণ্ণ হয়ে থাকতো।

কি হয়েছে তোমার, বলো আমাকে—বলতো ডুলারীবাঈ,—আমায় কি তোমার ভালো লাগছে না? তোমার কি চাই বলো। যা চাই সব নাও, আমার যা আছে, সব কিছু নিয়ে নাও।

লছমীপ্রসাদকে ডুলারী সব কিছু দিতে রাজী,—নিজের মন, নিজের হৃদয়, নিজের সময়, নিজের অর্থ ঐশ্বর্য, সব কিছু। শুধু সোনার খাঁচার দরজাটি খুলে দিতে রাজী নয়। তাকে কলকাতার বাইরে যেতে দেবে না, কোথাও কোনো আসরে গান গাইতে দেবে না, গানের রেকর্ড করতে দেবে না, অন্য কোনো ছাত্র বা ছাত্রীকে শেখাতে দেবে না।

ফিরোজাবাঈ মাঝে মাঝে বলতো, "কেন ওর জিন্দগী বরবাদ করে দিচ্ছো ডুলারী?"

"বরবাদ করে দিচ্ছি!" ডুলারী মায়ের কথা শুনে জ্বলে উঠতো, "আমি ওকে যা দিয়েছি, আর কেউ ওকে তা দিতে পারতো? আমি কাউকে যা দিইনি, ওকে তাই দিয়েছি।"

ডুলারীবাঈ বুঝতো না। লছমীপ্রসাদও জানানোর চেষ্টা করতো না। নিজের জীবনের দুঃখ নিজের হৃদয়ে চেপে রেখে সারাদিন

পড়ে থাকতো তুলারীর কাছে। সন্ধ্যেবেলা তুলারীর সময় নেই, মুজরা আছে, সে বাড়িতেই হোক বা বাইরেই হোক। অভ্যাগতের ভিড় আছে, আমন্ত্রণের চাপ আছে,—কিন্তু যেখানেই থাক রাত বারোটার মধ্যে ফিরে সে আসবেই। রাত বারোটার পরে সে কাউকে সময় দিতে রাজী নয়, সে রাজা মহারাজা যেই হোক না কেন! লাখ টাকা দিলেও সে তার বাঁধা সময়ের বেশি বাইরে থাকতে রাজী নয়। বারোটা বাজতে না বাজতেই বাড়ি ফিরে আসতো তুলারীবাঈ।

তখন আবার ডাক পড়তো লছমীপ্রসাদের।—কোথায় তুমি? এসো গান শোনাও, গান শেখাও, গেলাসে হুইস্কি ঢালো। কেন, সে কি কথা? আজ এত ক্লান্ত কেন? এসো, আমার কাছে এসো, আমি তোমার সব ক্লান্তি, সব অবসাদ দূর করে দিচ্ছি—।

তারপর রাত তুটো তিনটে চারটে হতে হতে একেবারে শেষ রাত্তিরে যখন তুলারী আর ঘুমের ভারে চোখ খুলতে পারছে না, তখন লছমীপ্রসাদের ছুটি।

সারাদিনের মধ্যে একটু ভালো লাগতো শুধু সন্ধ্যেবেলা। তখন তুলারী থাকে না। ফিরোজাবাঈয়ের শরীর ভালো যাচ্ছে না ইদানীং, অসুখে ভুগছে। ইদানীং মুজরা আর করে না বড়ো একটা। বয়েসও হয়ে আসছে। সন্ধ্যেবেলা সে লছমীপ্রসাদকে নিজের কাছে ডেকে এনে কাছে বসিয়ে গল্প করে, একটু একটু করে জেনে নেয় তার দেশের কথা, তার সংসারের আর দশজনের কথা।

লছমীপ্রসাদের বোন তাকে চিঠি লিখেছে,—ভাইয়া, অনেকদিন তুমি দেশে আসো নি, চিঠি লিখলে উত্তর দাও না। মা সব সময় তোমার জন্যে কাঁদে।

"তুমি চলে যাও, লছমীপ্রসাদ," ফিরোজাবাঈ বলতো মাঝে মাঝে।

"হ্যাঁ, ভাবছি তুলারীকে বলে কয়েকদিনের জন্যে দেশে যাবো।"

"কয়েকদিনের জন্যে নয় ভাই, তুমি একেবারে চলে যাও।

এখানে থাকলে তোমার জিন্দগী একেবারে বরবাদ হয়ে যাবে,” বলতো ফিরোজাবাঈ, “আমি তুলারীর মা। তবু আমি বলছি তুমি চলে যাও।”

একদিন তুলারীবাঈ খুব তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরলো। তখন দশটা বাজেনি। জান্‌কীকে জিজ্ঞেস করলো, “লছমীপ্রসাদজী কোথায় ?”

“বড়ী বাঈজীর ঘরে বসে কথা বলছেন,” জানালো জান্‌কী।

তুলারীবাঈ আস্তে আস্তে মায়ের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালো। দেখলো, ফিরোজাবাঈয়ের সঙ্গে বসে গল্প করছে লছমীপ্রসাদ। ওর দেশের এক দেহাতী মেলার গল্প। ওরা গল্পে এত মশগুল যে টেরই পেলো না কখন তুলারী এসে দরজার একপাশে দাঁড়িয়েছে।

তুলারী চুপচাপ দাঁড়িয়ে শুনলো ওদের গল্প। খুব সহজ, খুব ঘরোয়া স্বচ্ছন্দ গল্প।

শুনতে শুনতে তুলারী বিষণ্ণ হয়ে গেল নিজের অজান্তে। তার কাছে তো লছমীপ্রসাদ এত সহজ, এত ঘরোয়া, এত স্বচ্ছন্দ নয়। তুলারীর সামনে দেখা যায় লছমীপ্রসাদের মধ্যে একটা চাপা অধীরতা, যা থেকে থেকে তাকে আরো আনমনা করে দেয়। হয়তো এই তার স্বাভাবিক রূপ—তুলারী ভাবতো। তাই এতদিন বুঝবার অবকাশ হয়নি।

আজ মনে হোলো সে লছমীপ্রসাদকে যতোই দিক, কোনোদিন তার মন ভরিয়ে দিতে পারবে না।

সে আস্তে আস্তে ফিরে এলো নিজের ঘরে। শুয়ে পড়লো চুপচাপ, এত ক্লান্তি বোধ করলো যে একবার উঠে আলোটাও নিভিয়ে দিতে ইচ্ছে হোলো না। এক একবার রাগ হোলো খুব, কিন্তু কার উপর রাগ করবে ভেবে পেলো না,—লছমীপ্রসাদের উপর

নয়, নিজের উপর নয়, মায়ের উপর নয়, কমলের উপর নয়, জান্‌কীর উপর নয়, সিংদেওজীর উপর নয়, কারো উপর নয়।

অনেকক্ষণ পর লছমীপ্রসাদ ঘরে ঢুকলো। দেখলো তুলারীবাঈ বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে আছে। একপাশে বসে বললো, "তুমি যে এসেছো, আমায় খবর দাওনি কেন। এইমাত্র জান্‌কী বললো, ছোটী বাঈজী এসেছে অনেকক্ষণ, এসে শুয়ে পড়েছে। তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে ?"

"না।"

"আজ গান শিখবে না ?"

"না," আস্তে আস্তে পাশ ফিরে বললো তুলারীবাঈ।

"খেয়েছো ?"

"খাবো না।"

"কেন ?"

"ক্ষিধে নেই। খেতে ইচ্ছে করছে না।"

লছমীপ্রসাদ একটু তাকিয়ে দেখলো তুলারীকে। তারপর বললো, "আচ্ছা, তাহলে আমি একটা গান গাই, শোনো।"

"না, থাক," বললো তুলারীবাঈ, তারপর লছমীপ্রসাদের ছায়া-নেমে-আসা মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, "আচ্ছা, গাও শুনি।"

লছমীপ্রসাদ আস্তে আস্তে ধরলো তাদের প্রিয় গান,—গোরী, তেরে নয়না কাজর বিন কারে……।

শুভ্রবরণে, তোমার চোখ তুটো কাজল বিনাই কালো,—চোখ বুঁজে চুপচাপ শুনলো তুলারী। তারপর বললো, "আজ থাক লছমীপ্রসাদ, আমার গান শুনতে ভালো লাগছে না।"

"কেন, কি হয়েছে ?"

"কিচ্ছু হয়নি।"

তুজনেই চুপ করে রইলো অনেকক্ষণ।

তারপর তুলারী আস্তে আস্তে বললো, "লছমীপ্রসাদ, তুমি চলে যাও।"

প্রথমটা সে বুঝতেই পারলো না তুলারী কি বলছে। বুঝতে সময় লাগলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "কোথায় যাবো

তুলারী কোনো উত্তর দিলো না। চোখ বুঁজে পাশ ফিরলো।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকবার পর লছমীপ্রসাদ ডাকলো, "তুলারী!"

কোনো উত্তর পেলো না।

মনে হোলো যেন তুলারী ঘুমিয়ে পড়েছে।

লছমীপ্রসাদ যদ্দিন চলে যেতে চেয়েছিল, তদ্দিন তুলারী তাকে যেতে দেয়নি। এখন তুলারী তাকে চলে যেতে বলার পর সে দেখলো বাইরের পৃথিবী আর তার মধ্যে এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর।

সে একটা অসহনীয় অবস্থার মধ্যে পড়লো। চলে যেতেও পারছে না, থাকতেও পারছে না। গান বন্ধ হয়ে গেল। তুলারীর সঙ্গেও বেশী দেখা হোতো না, দেখা হলেও বেশী কথাবার্তা হোতো না, যেটুকু হোতো সে শুধুমাত্র একই পরিবারের দুজন নির্লিপ্ত পরিজনের আটপৌরে সংলাপ।

"কি হয়েছে তোমার?" প্রথম প্রথম দুএকবার জিজ্ঞেস করেছিলো লছমীপ্রসাদ।

"কি হবে আবার? কিচ্ছু না," উত্তর দিতো তুলারী।

"তুমি আমার সঙ্গে আগের মতো নও কেন?"

"আগে আবার কি রকম ছিলাম," তুলারীবাঈয়ের নিস্পৃহ উত্তর। ভুরু তুলে একটু যেন অবাক হয়ে তাকাতো লছমীপ্রসাদের দিকে।

সে চাউনির সামনে দাঁড়িয়ে লছমীপ্রসাদের মুখে কোনো উত্তর জোগাতো না।

"তুমি আমার সঙ্গে আজকাল বেশী কথা বলো না কেন?" এক একদিন জিজ্ঞেস করতো লছমীপ্রসাদ।

"কি বলবো?" একটু ভুরু উঁচু করতো তুলারীবাঈ।

কোনো উত্তর দিতো না লছমীপ্রসাদ, চেপে রাখতো একটি উদ্‌গত দীর্ঘশ্বাস।

নিজের মনে একদিন গান গাইছিলো লছমীপ্রসাদ,—সজন তুম কাহে নেহা লগায়,...প্রিয় তুমি কেন ভালোবেসেছিলে...।

তুলারীবাঈ পাশ কাটিয়ে চলে গেল, একবার দাঁড়ালোও না, লক্ষ্যও করলো না।

সঙ্গে সঙ্গে গান বন্ধ করলো লছমীপ্রসাদ।

তুলারীবাঈ লছমীপ্রসাদকে চলে যেতে ওই একবারই বলেছিলো।

একবারের বেশী তুবার বলার যে প্রয়োজন নেই, সেকথা তুলারীও জানতো, লছমীপ্রসাদও জানতো।

তবু লছমীপ্রসাদ যেতে পারলো না। তুলারীও তাকে কিছু বললো না।

তুটো তুঃসহ মাস এমনি কেটে গেল।

একদিন নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায় লছমীপ্রসাদের হঠাৎ মনে হোলো যেন তুলারী গান গাইছে ফিরোজাবাঈয়ের ঘরে বসে।

সে উঠে বসলো চট করে।—তুলারী তো বেরিয়ে গেছে একটু আগে! ফিরলো কখন?

একটু কান পেতে শুনলো।—হ্যাঁ তুলারীর গলাই, এবং গানটিও

তারই কাছে শেখা, কিন্তু তুলারী গাইছে না। তুলারী বাড়ি নেই। গ্রামোফোনে রেকর্ড বাজছে।

জান্‌কী ঘরে ঢুকলো কি একটা কাজে।

লছমীপ্রসাদ তাকে জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা, ছোটী বাঈজীর গলা মনে হচ্ছে না?"

"হ্যাঁ," উত্তর দিলো জান্‌কী।

"ছোটী বাঈজী রেকর্ডে গান দিলো কবে?" জিজ্ঞেস করলো লছমীপ্রসাদ।

জান্‌কী একটু হাসলো। বললো, "এই তো কয়েকদিন আগে। কেন, আপনাকে বলে নি?"

লছমীপ্রসাদ কোনো উত্তর না দিয়ে শুয়ে পড়লো।

পরদিন সকালবেলা ঘুম ভাঙলো অনেক বেলায়।

বাইরের ঘর থেকে তুলারীর গান ভেসে এলো। আর সেই সঙ্গে আরেকটি উদাত্ত পুরুষকণ্ঠ। একটুখানি শুনেই লছমীপ্রসাদ বুঝলো যে সঙ্গীতে সে লোকটির অনন্যসাধারণ পারদর্শিতা। খুব চেনা গলা। কিন্তু কে সে?

আস্তে আস্তে বাইরের ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। দেখেই চিনতে পারলো সে।

গান গাইছে ভারতবিখ্যাত ওস্তাদ ছোটে বরকতউল্লা সায়েব। তার কাছে গান শিখছে তুলারীবাঈ। এক পাশে বসে সঙ্গত করছে হাজারীপ্রসাদজী।

সামনে একটি চাঁদির থালার উপর একটি সিল্কের কুর্তা, একটি শাল ও পাঁচটা গিনি। একপাশে ধূপদানে জ্বলছে সুগন্ধী ধূপ।

আর একধারে চুপচাপ বসে আছে নারঙ্গীপুরের চৌধুরীবাবু আর ফিরোজাবাঈ।

লছমীপ্রসাদ ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াতে তুলারীবাঈ চোখ তুলে তার দিকে তাকালো, তারপর চোখ ফিরিয়ে আবার আরেকটি তান ধরলো।

নারঙ্গীপুরের চৌধুরীবাবু আর ফিরোজাবাঈ বসে ছিলো দরজার দিকে পেছন ফিরে। ওরা লছমীপ্রসাদকে লক্ষ্য করলো না।

কেউ তাকে ভেতরে ডাকলো না। সে কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে ফিরে চলে গেল।

নিজের ঘরে ফিরে এসে অনেকক্ষণ বসে রইলো চুপচাপ। তারপর একবার উঠে গিয়ে ফিরোজাবাঈয়ের ঘর থেকে নিয়ে এলো তুলারীর গানের রেকর্ড। ফিরে আসবার সময় দেখা হোলো জান্‌কীর সঙ্গে।

জান্‌কী খুব খুশি-খুশি মুখ করে বললো,—ছোটে বরকতউল্লা সায়েব তো সহজে কাউকে নাড়া বাঁধেন না। নারঙ্গীপুরের চৌধুরী-বাবুর কথাতেই উনি ছোটী বাঈজীকে গান শেখাতে রাজী হয়েছেন।

"অনেক টাকা নিচ্ছেন নিশ্চয়ই," নিজেকে নিস্পৃহ দেখাবার চেষ্টা করলো লছমীপ্রসাদ।

"যতো টাকাই নিন, নারঙ্গীপুরের চৌধুরীবাবুর কাছে সে কিছুই নয়," মুখ টিপে হেসে জান্‌কী উত্তর দিলো।

সারা তুপুর-বিকেল সবাই দেখলো লছমীপ্রসাদের ঘরের দরজা বন্ধ, সবাই শুনলো সে বার বার তুলারীবাঈয়ের রেকর্ড বাজিয়ে শুনছে।

সন্ধ্যের কিছুক্ষণ পরে তুলারীবাঈ গাড়িতে উঠে চলে গেল।

সেদিন নারঙ্গীপুরের ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর বাড়িতে মুজরা

তার বিলোল কটাক্ষ, জাতুকরী ভ্রুভঙ্গী আর মদির অধর-স্ফুরণ সবার রক্তে আগুন ধরিয়ে দিলো। একটা তুর্ধর্ষ আবেদন তার সিঙার-সজ্জায়, মুখে ফুটে উঠেছে রুক্ষ নিষ্ঠুরতা, সে যেন তাকে একেবারে অপ্রতিরোধ্য করে তুললো।

কেউ জানলো না যে তার মনে তখন ঝড় বইছে। মনের চোখ দিয়ে সে শুধু দেখছে একটি বন্ধ দরজা, যে দরজার ওপাশে একজন বসে বার বার তার গানের রেকর্ড বাজাচ্ছে।

মুজরায় সেদিন কেউ তার মুখে শৃঙ্গার-রসাত্মক ঠুমরি শুনলো না, সবাই শুনলো একটি নতুন গজল। দিল্লীর শেষ বাদশাহ্ কবি বাহাতুর শা-র রচনা সেই গান, লক্ষ্ণৌ-বেনারসের বাঈজী মহলে চলে আসছে পুরুষানুক্রমে। আজ কি জানি কেন সেই গানই বার-বার মনে পড়লো তুলারীবাঈয়ের :

—ন ম্যয় শওক হুঁ......ন ম্যয় গুলফিজাঁ......আমি কোনো শখ নই, আমি নই ফুলের বাহার,......

আ-হা-হা,—শোনা গেল শ্রোতাদের কণ্ঠে।

—ন কিসী কা আশীকজার হুঁ......, আমি ভালোবাসি না কাউকে......।

ওআহ্, ওআহ্, ওআহ্,—গুঞ্জন উঠলো শ্রোতাদের মধ্যে।

—ম্যয় উস বিরাঁ কী হুঁ ফিজাঁ..., আমি সেই বসন্ত-বাহার যে এসে চলে গেছে...

শ্রোতারা মাথা নেড়ে নেড়ে উপভোগ করলো সুরের রস।

—কিসী খোয়ে হুয়ে দিল কী পুকার হুঁ..., আমি কোনো এক হারানো মনের আহ্বান...

আ—হা হা হা হা, আ—হা, আ—হা, আ—হা,—উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো রসিক শ্রোতারা।

অনেক রাতে গান শেষ করে আসর থেকে উঠে অন্য একটি ঘরে বিশ্রাম করতে গেল তুলারীবাঈ। গ্লেলাসে হুইস্কি ঢেলে

দুলারী যেই মুখে তুলবে, এমন সময় ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ঘরে ঢুকলো মুখ ম্লান করে। বললো, "একটা খারাপ খবর আছে।"

দুলারী গেলাস নামিয়ে তার দিকে তাকালো।

ইন্দ্রনারায়ণ বললো, "লছমীপ্রসাদ বিষ খেয়েছে। তোমার মা লোক পাঠিয়েছেন। বলে পাঠিয়েছেন, তুমি যেন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যাও।"

দুলারী আস্তে আস্তে গেলাস মুখে তুললো। তারপর উত্তর দিলো, "আমি আর তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে কি করবো। ওকে বলে দিন বাঈজী বলছে, আমার ফিরতে দেরী হবে, অনেক অনেক দেরী হবে।"

নারঙ্গীপুরের চৌধুরী সাহেব আস্তে আস্তে দুলারীর পাশে বসে তার কাঁধে হাত রাখলো। অনেকক্ষণ পরে বললো, "লছমীপ্রসাদ আমার খুব বন্ধু ছিলো।"

দুলারীবাঈ একটু হাসলো, হেসে উত্তর দিলো, "সে আমারও খুব বন্ধু ছিলো।"

চুপ করে রইলো ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।

দুলারী আস্তে আস্তে একটি উর্দু শের আবৃত্তি করে গেল নিজের মনে—এই বেদরদী দুনিয়ায় যার সঙ্গে যতক্ষণ, তার সঙ্গে গভীর ভালবাসাও ততক্ষণ। হৃদয়ের পেয়ালার মদ একবার যদি ফুরিয়ে যায়, তাতে আবার মদ ঢালো, নেশা আরও জমাট হয়ে উঠবে।

পাঁচ

দুপুর গড়িয়ে এলো।

দিবানিদ্রার আমেজে আশেপাশের বাড়ি স্তব্ধ হয়ে আছে। সামনের বাড়ির বারান্দার এক কোণে একটুখানি ছায়ায় ঘুমিয়ে আছে একটি শাদা বেড়াল। সেদিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে দুলারীবাঈ কপালে হাত দিয়ে শরীরের উত্তাপ অনুভব করলো। বেশ চেপে জ্বর এসেছে। পশ্চিমের জানালা দিয়ে বড়ো রোদ্দুর আসছে ঘরের ভিতর।

বৃন্দা এসে জানালা বন্ধ করে দিয়ে গেল।

চোখ বুঁজে শুয়ে শুয়ে দুলারীবাঈ ভাবছিলো। কমল চলে গেল, লছমীপ্রসাদ চলে গেল। সিংদেওজী মাঝে মাঝে আসতো। কিন্তু তার জন্যেও সময় হোতো না দুলারীবাঈয়ের। নারঙ্গীপুরের ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী তখন তার ওখানে প্রায় প্রত্যেক সন্ধ্যার নিয়মিত অতিথি। অন্য কারো দিকে কটাক্ষপাত করবার ফুরসতও তার নেই।

একদিন সিংদেওজী এসে নিরিবিলি পেয়ে গেল দুলারীকে।

সেদিন সে অনেক রাত অবধি বসে গান শুনলো। তারপর এক গোছা নোট থালায় রেখে বললো, "আমি বম্বে চলে যাচ্ছি দুলারীবাঈ। ওখানে এত কাজের চাপ পড়বে যে কলকাতায় বেশী আসা আর হয়ে উঠবে না। সালে তিন বার কি চার বার, তার বেশী নয়।"

কে কোথায় কখন কেন চলে যায় অতো কথা জানবার স্পৃহা খুব কম বাঈজীরই থাকে। থাকলে চলেও না। দুলারীবাঈ খুব অমায়িকতার সঙ্গে বললো, "সালে তিনবার কি চারবার যখনই আসবেন তখন যদি আমাকে য়াদ করেন তো সৌভাগ্য বলে মানবো।"

সিংদেওজী এ্যাশ-ট্রে'তে সিগারেটের ছাই ঝেড়ে বললো, "যতো দূরেই যাই তুলারীবাঈ, তোমার কথা আমার সব সময়েই মনে পড়বে।"

"আপনার খুব মেহেরবানী," তুলারী হাসলো, "আমরা সামান্য লোক।"

"সামান্য!" সিংদেওজী আরেকটি সিগারেট ধরালো, "ওরকম গানের গলা ভগবান যাকে দিয়েছেন সে খুব সামান্য নয়।"

জ্বর যেন বাড়ছে আস্তে আস্তে। বিছানায় নিস্পন্দ হয়ে পড়েছিলো তুলারীবাঈ। অনেক পুরোনো দিনের ওপার থেকে কথা-গুলো বার বার তার মনে ফিরে এলো,—তুলারীবাঈ, ওরকম গানের গলা ভগবান যাকে দিয়েছে সে খুব সামান্য নয়।

সেটা উনিশশো উনচল্লিশ সাল। সবে ইউরোপে যুদ্ধ বেধেছে। তখন তার একুশ বছর বয়েস, তার রূপ আর গানের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে কলকাতার অসামাজিক রসিক মহলে। তার মুজরার বায়না আসে ঐশ্বর্যবান অভিজাত মহল থেকে, তার নিজের বাড়িতে অভ্যাগত হয়ে শুধু তারাই আসে যাদের অনৈতিকতার মধ্যেও একটা বনেদীয়ানা আছে।

সাধারণ লোকের জন্যে বাজারে আছে তার গানের রেকর্ড,—তুলারীবাঈয়ের ঠুমরি, তুলারীবাঈয়ের গজল ও দাদরা।

"সামান্য!" সিংদেওজী বলছিলো, "ওরকম গানের গলাভগবান যাকে দিয়েছে সে খুব সামান্য নয়।"

সিংদেওজী যেভাবে কথাটা বললো তার মধ্যে একটা বেদনার ব্যঞ্জনা ছিলো। সেটা তুলারীবাঈ মেয়েদের মন দিয়ে বুঝলো।

জীবনের দাড়িপাল্লার একদিকে তাকে আর অন্যদিকে অন্য কোনো একজনকে রেখে যেন ওজন করছে সিংদেওজী।

আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, "আপনি কি আপনার স্ত্রীকেও বোম্বে নিয়ে যাচ্ছেন?"

সিংদেওজী ম্লান হাসি হাসলো। বললো, "হ্যাঁ, নিয়ে যাচ্ছি।"

"আপনি এত বেশী রাত পর্যন্ত বাইরে কাটান, তাতে উনি কিছু মনে করেন না?" দুলারীবাঈ খুব মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করলো।

"মনে করলেই বা আমার কি করবার আছে?"

"কেন?" আঙুলে আঁচলের খুঁট জড়াতে জড়াতে দুলারী জিজ্ঞেস করলো।

সিংদেওজী একটু আতর শুঁকলো। তারপর বললো, "আমার স্ত্রী খুব সুন্দর দেখতে। রাজপরিবারের মেয়ে। খুব বুদ্ধিমান, খুব কর্তব্যপরায়ণ, খুব সব-কিছু। কিন্তু জানো দুলারীবাঈ, সে ঠিক সেই ধরনের মেয়ে যাদের সংসারের সবাই ভালোবাসে শুধু তার নিজের স্বামী ছাড়া। সে সংসারের সব কাজ জানে, শুধু নিজের স্বামীকে সুখী করতে জানে না।"

"তাই বুঝি আমার মতো সাধারণ একটি বাঈজীকে খুব অসামান্য মনে হয়?" জিজ্ঞেস করলো দুলারীবাঈ। একটু ব্যঙ্গ করেই বলতে চেয়েছিলো সে। কিন্তু নিজের অজান্তে কথাগুলো স্নেহে আর সহানুভূতিতে ভরে গেল।

সিংদেওজী উত্তর দিলো একটু ভারী গলায়, "এখানে এসে বসতে ভালো লাগে, তোমাকে ভালো লাগে, তোমার গান শুনতে ভালো লাগে, তোমার সঙ্গে সময় কাটাতে ভালো লাগে,—ব্যস, আমি এর বেশী কিছু জানি না। হ্যাঁ, এ-টুকু জানি যে, এই ভালো-লাগা আমি আর কোথাও পাই না।"

দুলারীবাঈ সিংদেওজীকে এক পলক তাকিয়ে দেখলো।

তারপর দারোয়ানকে ডেকে বলে দিলো নিচে ফাটক বন্ধ করে দিতে। বলে দিলো, আর কেউ এলে যেন বলে দেয় বিবিজী আর কারো সঙ্গে দেখা করবে না। তারপর সিংদেওজীকে বললো, "আপনার সঙ্গে তো শিগগির আর দেখা হবে না, আমার একটা অনুরোধ রাখবেন?"

"বলো—। নিশ্চয়ই রাখবো।"

"আজ এখানেই খেয়ে যান।"

সিংদেওজী একটু অবাক হয়ে তাকালো তুলারীর দিকে।

তুলারীবাঈ বললো তাড়াতাড়ি, "আপনার বাড়ির মতো অতো ভালো খাওয়া দিতে পারবো না হয়তো তবু খুব খারাপও হবে না। জান্‌কী খুব ভালো রাঁধে। ওকে বলে দিচ্ছি বিরিয়ানী তৈরী করে দেবে। গোস্ত-বিরিয়ানী আপনার খারাপ লাগবে না।"

সিংদেওজী একটু হেসে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি আমার জন্যে কি তৈরী করে দেবে?"

"আমি?" তুলারীবাঈ হাসলো, "আমি পান সেজে দেবো।"

"ব্যস? আর কিছু করবে না?"

"কেন? আসন পেতে দেবো।"

"তারপর?"

"থালী আর পানির গেলাস বয়ে এনে দেবো।"

"আর কি করবে?"

"সামনে বসে পাখা করবো। এটা খান, ওটা খান, আরেকটু খান।"

"তারপর?"

"খাওয়ার পর হাতধোয়ার জল দেবো। হাতধোয়া হয়ে গেলে গামছা তুলে দেবো আপনার হাতে।"

"তারপর বলবে, অনেক রাত হোলো, এবার বাড়ি যান।"

"রাত যদি অনেক হয়, আমার কি দোষ বলুন," বলে সিংদেওজীকে বসিয়ে তুলারীবাঈ ভেতরে চলে গেল।

অনেকক্ষণ পরে তুলারী যখন খাওয়ার জায়গা দিয়ে ডাকতে এলো সিংদেওজীকে, তাকে দেখে সিংদেওজী অবাক হোলো। সত্তস্নাতা তুলারীর গায়ে আর জড়োয়া আভরণের বাহার নেই, খুলে ফেলেছে জমকালো বেনারসীর সাজ। হাতে শুধু দু গাছা চুড়ি, ফর্সা গলায় শুধু একটি সরু সোনার চেন। গায়ে একটি সাদা সুতির ব্লাউস, পরনে মিলের শাড়ি, পশ্চিমা মেয়েদের আটপৌরে ধরনে শাড়ির আঁচল পেছন থেকে ডান কাঁধের উপর দিয়ে নিয়ে এনে বাঁদিকে কোমরে জড়ানো। খোলা ভেজা চুল পেছনে এলিয়ে দেওয়া। আর বাম হাতে একটি বেল ফুলের মালা জড়ানো।

এই সহজ সাজে তুলারীকে আগে কোনোদিন দেখেনি সিংদেওজী। কোন বাঈজীকেই বা কে দেখেছে ?

সিংদেওজীর বিমুগ্ধ চাউনির সামনে যেন তুলারী একটু লজ্জা পেলো।

চোখ নামিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "কি দেখছেন ?"

"দেখছি, তুমি কতো সুন্দর। এই ঘরোয়া সাজে আরো কতো বেশী সুন্দর দেখায় তোমাকে," বললো সিংদেওজী।

"শুধু আমার দিকে তাকিয়ে থাকলে তো পেট ভরবে না," বললে তুলারীবাঈ, যেমনি করে সব ভালো মেয়েরা খেতে-ডাকতে এসে বলে তাদের প্রিয়জনদের, "খাওয়ার জায়গা দেওয়া হয়েছে। আসুন।"

নিজে সামনে বসে থেকে সিংদেওজীকে যত্ন করে খাওয়ালো তুলারীবাঈ।

সিংদেওজী খেতে খেতে আনমনা হয়ে যাচ্ছিলো। তুলারী লক্ষ্য করলো। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করলো না।

খাওয়া হয়ে গেল। বাইরের ঘরে এসে বসলো সিংদেওজী। তুলারীবাঈ তার পেছনে তাকিয়াটা ঠিক করে দিলো। চাকর এসে গড়গড়া রেখে গেল। তুলারী উঠে গিয়ে পান নিয়ে এলো।

গড়গড়ায় টান দিলো সিংদেওজী। সুগন্ধী তামাকের আবেগে চোখ বুজলো। তারপর বললো, "তুমি যে কাউকে এরকম যত্ন করতে পারো জানতাম না।"

"মাঝে মাঝে পারি," ত্থলারীবাঈ হেসে উত্তর দিলো, "সব সময় পারি না।"

"সব সময় যদি পারতে," বললো সিংদেওজী, "আমি তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকতাম।"

ত্থলারী একবার ভাবলো কোনো উত্তর দেবে না। তারপর আস্তে আস্তে বললো, "কারো জন্যে বেশী মায়া মমতা ভালো নয়। কষ্ট পেতে হয় তাহলে।"

সিংদেওজী আর কোনো কথা বললো না। চুপচাপ গড়গড়া টানতে লাগলো। তার কপালটা একটু ঘেমে উঠেছিলো। ত্থলারীবাঈ আঁচল দিয়ে তার কপাল পুঁছে দিলো। তারপর তার পাশে বসে পাখা করতে লাগলো।

কিছুক্ষণ চুপচাপ গড়গড়া টানবার পর, তামাক যখন প্রায় শেষ হয়ে এলো, সিংদেওজী বললো, "অনেক রাত হোলো, এবার বাড়ি ফিরতে হবে।"

ত্থলারী তাকালো তার দিকে। জিজ্ঞেস করলো, "সত্যি এবার যেতে হবে আপনাকে?"

সিংদেওজী তাকালো ত্থলারীর দিকে। বললো, "যদি বলো তো যাবো না।"

"আপনার ইচ্ছে," ত্থলারী মুখ টিপে হেসে উত্তর দিলো।

সিংদেওজী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটু ভাবলো। তারপর হঠাৎ খুব উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলে উঠলো, "ত্থলারীবাঈ, তুমি যদি বলো বোম্বে যাবো না। থেকে যাবো কলকাতায়। তাহলে তোমার সঙ্গে আমার প্রত্যেকদিন দেখা হবে।"

ত্থলারী হেসে ফেললো। বললো, "সিংদেওজী, আপনি বোম্বে

চলে যাচ্ছেন বলেই আজ আপনাকে এত যত্ন করছি, দারোয়ানকে বলে দিয়েছি ফটক বন্ধ করে দিতে যাতে আর কেউ না আসে।"

সিংদেওজী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর কোনো কথা না বলে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গেল। সেখানে একটু দাঁড়ালো। আবার ফিরে এলো সেখান থেকে। ফিরে এসে গা থেকে শেরওয়ানিটা খুলে গদির একপাশে ছুঁড়ে ফেলে একটি তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে পড়ে বললো, "চলে গিয়েই বা কি হবে। তোমার এত প্যার যদি শুধু একটি রাতের জন্যে, তাহলে ওই একটি রাতই সই।"

ওই একটি রাতের স্মৃতি কোনোদিনই ভুলতে পারেনি সিংদেওজী। তবে আর কোনোদিন কোনো উচ্ছ্বাসও দেখায় নি। মাঝে মাঝে যখনই বোম্বে থেকে কলকাতায় আসতো অন্তত একবারের জন্যে হলেও গান শুনতে আসতো দুলারীবাঈয়ের বাড়ি।

গান শুনতো, তারিফ করতো, টাকা দিতো, তারপর চলে যেতো।

ছয়

মাথা ধরাটা একটু বেড়ে যাচ্ছে।

দুলারীবাঈ ভাবলো, বৃন্দাকে আবার ডাকি। মাথাটা একটু টিপে দিক। তারপর ভাবলো, না, থাক, ও ঘুমোচ্ছে ঘুমোক, একটু বিশ্রাম করুক।

পুরোনো দিনগুলো আজ একটু বেশী করে মনে পড়ছে। মনে করতে ইচ্ছে করছে না, তবু মনে পড়ছে। এই মনে-পড়া ভালোও লাগছে। বৃন্দা এলে মাঝখান থেকে এই আমেজটা কেটে যাবে।

দুলারীবাঈ নিজেই নিজের কপালের দু-পাশটা একটু একটু টিপতে লাগলো। তারপর একটু হিসেব করতে লাগলো নিজের মনে,—সিংদেওজীর সঙ্গে সেদিনের সেই রাত······তখন উনিশশো উনচল্লিশ সাল।

এখন উনিশশো পঞ্চাশ শেষ হয়ে একান্ন শুরু হয়েছে।

তাহলে ক'বছর হোলো? ঠিক এগারো।

কতো পরিবর্তন, কতো ওলট-পালট হয়ে গেছে এই এগারো বছরে।

সিংদেওজী চলে গেল বোম্বে। তার জন্যে করুণা হয়েছিলো কিন্তু কোনো কষ্ট হয়নি। তখন নারঙ্গীপুরের ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী দুলারীবাঈয়ের বাবু হয়ে জাঁকিয়ে বসেছে।

খুব দরাজ হাত চৌধুরীবাবুর। এক সেট গয়না গড়িয়ে দিয়েছে তাকে, আর টাকা তো ঢেলে দিচ্ছে অঢেল। এ লোকটার কাছে একটা সুখ ছিলো। গানের ভালো সমঝদার ছিলো সে। অন্য কেউ গান বড়ো একটা বুঝতো না, শুধু সঙ্গীতসুধা পান করবার

জন্যেই তার কাছে আসতো না। গান শুধু একটা ছুতো, আসল আবেদন তার রূপের, তার পরিপূর্ণ যৌবনের।

নারঙ্গীপুরের চৌধুরীকেও একদিন বিদায় নিতে হলো।

ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর সঙ্গে তার সরিকদের মামলা চলছিলো কয়েকবছর ধরে। মামলায় শেষ পর্যন্ত হেরে গিয়ে তার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়লো।

সেদিন সন্ধ্যেবেলার কথা তুলারীবাঈয়ের আজো পরিষ্কার মনে আছে।

টলতে টলতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলো ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। মুখ থেকে ভুর ভুর করে বেরোচ্ছে বিলিতী মদের গন্ধ। প্রচুর মদ খেয়েছে সে। উপরে উঠে এসেই তুলারীবাঈকে জড়িয়ে ধরতে গেল। তুলারীবাঈ চট করে সরে গেল। চৌধুরীবাবু হুমড়ি খেয়ে পড়লো গদির উপর। রাগ করলো না। কোনোরকমে সামলে নিয়ে উঠে বসে বললো, "বাঈজী, বোতল বার করো, বোতল। আজ আর কিছু নয়, গান নয়, নাচ নয়, হাসি নয়, কান্না নয়, শুধু বোতল। শুধু বোতল আর বোতল, বোতলের পরে বোতল। তুলারীবাঈ, তুমি আমার পেয়ালা ভরে দেবে, আর আমি পেয়ালা শেষ করবো।"

ওর কথাবার্তার ঢং দেখে হাসি পেয়েছিলো তুলারীর, হাসছিলো তুলারীর সহচরী আয়েশাও। তাই দেখে প্রথমটা খুব রেগে গেল, চৌধুরী, বললো, "হাসছো? কেন?" তারপর তার গলা ভারী হয়ে গেল। আস্তে আস্তে বললো, "আমি সর্বস্ব হারিয়েছি তুলারীবাঈ। মামলায় হেরে গেছি, একেবারে হেরে গেছি।"

নিজের ঘরে মদের আসর প্রায়ই বসলেও বেসামাল মাতাল লোক একেবারে বরদাস্ত করতে পারতো না তুলারীবাঈ। তাই

ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর কথা শুনে তার জন্যে সহানুভূতি বোধ করলেও সেটা দেখাতে চাইলো না। একটু গম্ভীর হয়ে বললো, "আজ আপনার তবিয়ত ঠিক নেই চৌধুরীজী, আপনি বাড়ি যান।"

"বাড়িই যদি যাবো তো তোমার কাছে এলাম কেন বাঈজী," জড়িয়ে জড়িয়ে বললো ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী।

তুলারী তখন তার চাকরকে ডেকে বললো, "রাস্তার ওধারের চায়ের দোকান থেকে কামালউদ্দীন আর তিওয়ারীকে ডেকে দে তো। বলগে যে আমি ডেকে পাঠিয়েছি। ওরা এসে চৌধুরীজীকে নিচে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তুলে দেবে।"

কামালউদ্দীন আর তিওয়ারীকে নামে জানতো ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। খোলা চোখের চাউনি দিয়ে সে তুলারীবাঈকে নিরীক্ষণ করলো কিছুক্ষণ। বেদনায় ভরে উঠলো সেই চাউনি। বললো, "আমায় গাড়িতে তুলে দেওয়ার জন্যে কাউকে ডাকতে হবে না তুলারীবাঈ। আমি নিজেই যেতে পারবো।"

'তুলারী চুপ করে রইলো। কোনো কথা বললো না।

চৌধুরী পকেট থেকে এক তাড়া নোট বার করে এক পাশে রেখে দিলো। বললো, "এ টাকা তোমার জন্যে এনেছিলাম, বাঈজী। এগুলো নিয়ে তো আমি বাড়ি ফিরতে পারবো না। তুমিই রেখে দাও। আমি আর আসবো না।"

হঠাৎ তুলারীর চোখে জল এলো। কিন্তু জোর করে সামলে নিলো নিজেকে।

কেন এরা এত নিঃসহায়ের মতো ভালোবেসে ফেলে,—সে বার বার নিজেকে জিজ্ঞেস করলো। টাকা দিয়ে তাকে কিনতে এসে কেন নিজেরাই বিকিয়ে যায় তার মতো একজন অজ্ঞাতকুলশীল সামান্য মুজরাওয়ালীর কাছে। তারপর একদিন হঠাৎ মনে আঘাত পেয়ে মনে করে তার মতো মেয়ের কাছে শুধু টাকাটাই সব। এ-কথা মেনে নেয় যে-আঘাত পেয়ে, তারই প্রতিঘাতে তুলারীবাঈয়ের নিজের

অন্তর কেন হাহাকার করে ওঠে এই পরিবেশ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে, পালিয়ে মুক্তি পেতে চায় অন্য কোনো এক নতুন জীবনের মধ্যে যেখানে টাকাই জীবনের সবকিছু নয়, তারপর নিস্ফল হাহাকার করে নিজের অবস্থাকে মেনে নেয় সোনার খাঁচার নিরুপায় পাখির মতো।

ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী চলে যাওয়ার পর তুলারীবাঈ উঠে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। পাশের ঘরে গিয়ে চোখের জল পুঁছে মুখে আরেকটু পাউডার লাগিয়ে আবার ফিরে এলো।

ততক্ষণে আরেক দল লোক এসেছে তার মুজরা শুনতে।

তাদের সামনে বসে গান ধরলো তুলারীবাঈ,—বাঁকী তিরছি নজরিয়া লগায় গয়ো রী……

চোখের চাউনির অনন্য ভঙ্গিতে মাতিয়ে দিলো তাদের।

কে যেন বলে উঠলো,—আরে এ তো বাঈজী নয়, এ খুশির ফোয়ারা। বাঃ বাঈজী, বাঃ।

তুলারীবাঈ হাসির অমৃত ঢেলে তাদের তসলীম জানালো। শুধু তার অন্তর্যামীই জানলো যে জীবনের সমুদ্রমন্থনে যে গরল উঠেছে তাতে তার মনের ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে।

ওস্তাদ ছোটে বরকতউল্লা সায়েবের কাছে শিখে ইদানীং খুব ভালো খেয়াল গাইতে পারতো তুলারীবাঈ। কিন্তু সে শুধু তার নিজের আনন্দের জন্যে গাওয়া। আর কাউকে শোনানোর সুযোগ নেই। খেয়াল শোনবার জন্যে কেউ তুলারীবাঈকে ডাকে না বা তার কাছে আসে না। তার কাছে শুনতে চায় শুধু ঠুমরি আর গজল, বা দাদরা। কিন্তু আজকাল আর হাল্কা গান গাইতে তার ভালো লাগে না।

ফিরোজাবাঈ তখন বাতে শয্যাশায়ী। খুব লিভারের অসুখেও

ভুগছে। তাকে দেখাশোনা করবার জন্যে একজন ঝি ছিলো। মাকে বেশী দেখাশোনা করবার ফুরসত দুলারীবাঈয়ের হোতো না। সব সময় মায়ের কাছে গিয়ে বসতে ইচ্ছেও করতো না। এমনি বসে থাকলে কারণে অকারণে মন বিষণ্ণ হয়ে থাকে। বড্ড ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়ে সব কিছু। শুধু গান গাইলে সব কিছু ভুলে থাকা যায়। তাই বেশির ভাগ সময় গানের নেশায় মৌজ হয়ে থাকতো দুলারীবাঈ। সারাদিনে শুধু একবার কিছুক্ষণ ফিরোজা-বাঈয়ের কাছে বসতো।

কিন্তু এই অল্প কিছুক্ষণ বসাও দুলারীর কাছে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠলো। সে মায়ের কাছে যেতো একটু আদর পেতে, একটু আদর করতে। সে যে কতো নিঃসঙ্গ, তার মা না বুঝলে কে বুঝবে। কিন্তু ফিরোজাবাঈ বুঝতো না। একেবারে বস্তুতান্ত্রিক ফিরোজাবাঈয়ের কথাবার্তার বিষয়গুলো।

—গয়লা আজকাল দুধে জল দিচ্ছে। জান্‌কীকে বললাম, আর কেউ দেখবার নেই তো তুই দাঁড়িয়ে একটু দেখে নিস, কিন্তু সেও আমার কথা কানে তোলে না। বিছানায় পড়ে আছি তাই। তা নইলে কি কারো সাধ্যি ছিলো ফিরোজাবাঈজীর বাড়িতে জল মেশানো দুধ দেয়!

—দাঁতটা এত টনটন করছে, নতুন ঝি-টাকে বললাম একটু গরম জল করে এনে দে। আনছি, বলে সেই যে গেল আর সারাদিন দেখা নেই। ডেকে ডেকে আমার গলা ধরে যায়, কারো সাড়া পাই না। আগে আমার এক ডাকে দশজন লোক ছুটে আসতো, এখন বিছানায় পড়ে আছি, কে আর আমার তোয়াক্কা করে!

—রেশমজান বাঈজীর এক ঝি ছিলো। সেদিন আয়েশা বলছিলো সেই ঝি নাকি এখন নাম পাল্টে কি-যেন-একটা-বাঈ নাম নিয়ে কোথায় যেন আলাদা ঘর নিয়ে বাঈজী হয়ে বসেছে। কী সে গায় ভগবান জানেন। লোকেরও এমন নজর ছোটো

হয়ে গেছে আজকাল। গান কিছু বোঝে না। একটা কিছু গেয়ে দিলেই হোলো। কেউ যদি কসবী হতে চায় তো হোক, নিজেকে বাঈজী বলে জাহির করা কেন? বাঈজী হতে হলে একটা সাচ্চা খানদান চাই।

—ওই সারাওগীবাবু আজকাল কেশরবাঈয়ের ঘরে গিয়ে বসছে শুনছি। এমন বুদ্ধু! কেশরবাঈ যে আমাদের বয়েসী সেটা কী ওর মুখ দেখে টের পায় না? কেশরবাঈ যখন মুজরা করতে শুরু করলো, আমরা তখনো পায়ে ঘুঙুর বেঁধে ওস্তাদের কাছে তালিম নিচ্ছি।

—আমাকে দশটা টাকা দিবি তুলারী? বালিশের খোলগুলো সব ছিঁড়ে যাচ্ছে।

ভালো লাগতো না তুলারীর। কী হয়ে যাচ্ছে তার মা? ঠিক আর দশজন বাড়িউলীর মতো হয়ে যাচ্ছে তার মায়ের কথাগুলো। পুরোনো দিনের কথাগুলো তুলারীর মনে পড়লো। তখন তার মা ফিরোজাবাঈ দেখতে ছিলো রানীর মতো, মেজাজ আর হাবভাব কথাবার্তাও ছিলো তেমনি।

মায়ের উপর রাগ হোতো। কী দুঃখু তোমার শুনি। না হয় শরীরটা ভালো নয়, বিছানায় পড়ে আছো, তাতে তোমার অসুবিধেটা কী? অভাবটাই বা কিসের? যাদের কেউ দেখবার নেই তাদের কথা একবার ভাবো তো! চুপচাপ শুয়ে থাকো, ইলাজ করাও, দুধ খাও, ফল খাও, ফলের রস খাও, তা নয়,—আমার এখানে জ্বালা রে, এখানে ব্যথা রে, ও আমার এটা করলো না রে, সে আমার সেটা করলো না রে, অমুকবাঈ তমুকবাঈ ফলানাবাঈ গানের কী জানে রে, ও আমার মায়ের বয়েসী রে, সে আমার নাতির বয়েসী রে···

ফিরোজাবাঈয়েরও মনে কষ্ট ছিলো। সেটা তখন বোঝে নি তুলারীবাঈ। বুঝেছিলো অনেক অনেক বছর পরে।

সফল শিল্পীর শেষ জীবনের পঙ্গুত্ব কতো কষ্টের সে-কথা কী

করে বুঝবে অল্পবয়েসী বাঈজী তুলারী। সে তো সারাদিন তার গান নিয়ে পড়ে আছে, সারাদিন রেওয়াজে মশগুল হয়ে আছে, সংসারের ছোটোখাটো খুঁটিনাটি ঝঞ্ঝাট-ঝামেলার খবর নেওয়ার সময় তার কোথায়।

অনেকদিন ধরে ভাবলো তুলারী। শেষ পর্যন্ত মন স্থির করে ফেললো। এ ধরনের জীবনের জন্যে সে নয়। বেরিয়ে আসতে হবে এর ভিতর থেকে। এক সময়ে ভাবতো কাউকে অবলম্বন পেলে সে আস্তে আস্তে সরে যাবে এই পরিবেশ থেকে। ভাবতো, এসব ছাড়বোই যদি, একজন কারো জন্যে ছাড়বো, তাহলে কোনো কষ্ট হবে না, হলেও সইবে। এখন মনে হোলো ছাড়তে হলে নিজের জন্যেই ছাড়বো। অন্য কারো অপেক্ষায় বসে থাকা, সে শুধু নিজের মনে জোর না পাওয়ার সাফাই।

এবার আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসতে হবে এই পরিবেশ থেকে।

একদিন ফিরোজাবাঈকে বললো, "মা, ভাবছি মুজরা করা ছেড়ে দেবো।"

অসুখে ভুগে ভুগে ফিরোজাবাঈ একটু খিটখিটে হয়ে পড়েছিলো। তুলারীর কথা শুনে তার রাগ হোলো। জিজ্ঞেস করলো, "ছেড়ে দেবে? কেন?"

"ভালো লাগছে না।"

"ভালো লাগছে না? কেন?"

"কী লাভ! দিনের পর দিন ওই একই রকম জীবন। রেওয়াজ আর মুজরা, মুজরা আর রেওয়াজ। ওই একই রকমের লোক আসে প্রত্যেক সন্ধ্যায়, একই রকমের নেশা, একই রকম মেজাজ, কথাবার্তা। একজনকে আরেকজনের থেকে আর আলাদা করে চেনা যায় না। ওরা আমার সামনে বসে গান শোনে, গান

শুনতে শুনতে অনেক রাত হয়ে যায়, আর ওদের মুখ দেখে আমার শুধু বার বার মনে পড়ে বাড়িতে ওদের বিবি জেগে বসে আছে, ওদের মা-বোন জেগে বসে আছে। ভালো লাগে না।"

এ ধরনের কথাবার্তা ফিরোজাবাঈয়ের কাছে একেবারে নতুন। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, "ওদের মা-বোন-বিবির ভাবনা তুমি ভাববে কেন? মুজরা করা আমাদের পেশা। আমরা মুজরা করি, যার খুশি আসবে, যার খুশি আসবেনা। আমরা তো কাউকে জোর করে টেনে আনি না। ওদের মা-বোন-বিবি যদি ওদের বাড়িতে ধরে রাখতে না পারে আমাদের কী কসুর?"

"আমাদের কসুর এই যে, আমরা সব জেনে বুঝেও আমাদের দরজা খোলা রাখছি ওদের জন্যে।"

ফিরোজাবাঈ একটু দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো। বললো, "দরজা বন্ধ করে দিলেও কী হবে, দিনের শেষে যে মা-বোন-বিবির কাছে ফিরতে চায় না, সে কিছুতেই ফিরবে না, কোথাও না কোথাও সে খোলা দরজার খবর করে নেবেই। দরজা যদি কোথাও খোলা না পায় তাহলে রাস্তায় রাস্তায় আওয়ারা হয়ে বেড়াবে। কিন্তু বাড়ি ফিরবে না। এ একটা নেশা।"

"এ নেশা নয় মা, এ এক কিসিমের বিমার।"

"এ যদি বিমার হয় তো এর কোনো ইলাজ নেই।"

"ইলাজ আছে মা," বললো দুলারীবাঈ, "আউরতদের যদি মরদদের গোলামী করতে না হয়, যদি তাদের এই আজাদী থাকে যে নিজের স্বামীর কাছে প্যার-মুহব্বত না পেলে তারা অন্য কাউকে প্যার করতে পারবে, তাহলে এরকম হবে না। যদি আমাদের মতো কিছু মরদ-মুজরাওয়ালাও থাকতো, যাদের কাছে বিবিরা গিয়ে গান শুনবে, টাকা দেবে, রাত করে বাড়ি ফিরবে, আর তাদের স্বামীরা তাদের জন্যে রাত জেগে খিড়কীতে বসে থাকবে, তাহলে আর এরকম হবে না।"

। ফিরোজাবাঈ হেসে ফেললো। ভাবলো, তুলারীর মাথা খারাপ। বললো, "বেশ তো। মেয়েদের মানা করছে কে? ওরাও কোনো মরদ-মুজরাওয়ালার কাছে গিয়ে গান শুনলে পারে। খানদানী ঘরের খুবসুরত মেয়েদের এরকম খেয়াল হয়েছে শুনলে অনেক মরদ সব কাজ ছেড়ে দিয়ে এই পেশা নিয়ে নিতে ছুটে আসবে," বলে নিজের রসিকতায় নিজেই টেনে টেনে হাসলো।

কিন্তু তুলারী হাসলো না। সে একটু বিষণ্ণ, একটু গম্ভীর হয়ে রইলো। মায়ের হাসি থামতে আস্তে আস্তে বললো, "একটা কথা ভুলে যাচ্ছো মা, মেয়েরা পয়সা কামায় না, মেয়েদের রুজি-রোজগার নেই। একজন মেয়ে, সে ক্রোড়পতির বিবি হলেও, তার খসম্‌এর বাঁদী।"

"মেয়েরা পয়সা কামাতে শুরু করলে কি যে-সব ছেলের আদত খারাপ, তারা সব ভালো হয়ে যাবে?" জিজ্ঞেস করলো ফিরোজাবাঈ।

"না, তা নাও হতে পারে," তুলারী উত্তর দিলো, "তবে লোকের আদত খারাপ হলে বেশির ভাগ মেয়েকে তকলিফ পেতে হবে না। আর বিবির রোজগার থাকলে তার একটা অন্য ইজ্জতও হবে, আর ইজ্জত হলে সাচ্চা কিসিমের প্যার-মহব্বতও হবে। যেখানে বিবির ইজ্জত নেই সেখানে সত্যিকারের প্যার নেই, মহব্বত নেই, কিছুই নেই।"

"শোনো মেয়ের কথা," বলে উঠলো ফিরোজাবাঈ, "সংসারে এত স্বামী-স্ত্রী আছে, তাদের মধ্যে ভাব ভালোবাসা নেই।"

"ও রকম প্যার-মহব্বত রাস্তার কুত্তীর জন্যে রাস্তার কুত্তারও আছে। ওসব কথা আমায় বলতে এসো না মা, তুমি বাঈজীর মেয়ে, আমিও বাঈজীর মেয়ে, তুমিও অনেক দেখেছো, আমিও অনেক দেখেছি।"

ফিরোজাবাঈ ভাবলো, মেয়ের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। সে চুপ করে রইলো।

কি যেন ভাবছিলো তুলারীবাঈ। একটু পরে বললো, "আমার সঙ্গে স্কুলে পড়তো কুন্তী নামে একটি মেয়ে। আমার সঙ্গে খুব দোস্তি ছিলো। সে আমার চাইতে অনেক সুন্দর দেখতে, খুব মিষ্টি স্বভাব। আর, তার স্বামী আসতো আমারই কাছে। যদ্দিন ওর পয়সা ছিলো, তদ্দিন আমার পায়ে টাকা ঢেলে দিয়েছে, কুন্তীকে আদর করে তুটো গয়না গড়িয়ে দেয়নি। যেদিন তার সব টাকা শেষ হয়ে গেল, সেদিন সে আমার কাছে আসা বন্ধ করে দিয়ে কুন্তীকে খুব ভালোবাসতে শুরু করলো।"

"সে তো বেশ ভালো কথা," বললো ফিরোজাবাঈ।

"কি জানি মা, আমার বিশ্বাস হয় না। গরীব হয়ে গেলে বৌকে ভালোবাসবো, পয়সা হলে ভালোবাসবো না, এটা খুব ভালো কথা নয়। আসল কথাটা কী জানো, আমায় দেওয়ার মতো টাকা যখন নেই, তখন আমার কাছে আসবে কী করে। কিন্তু আউরত তো চাই। কিন্তু মুফতের আউরত বৌ ছাড়া আর কে আছে? সুতরাং এখন বৌয়ের নেশায় মশগুল। যেই প্যার-মহব্বতের বাত আমাকে শুনিয়েছে, সে সব এখন নিজের বিবিকে শোনাচ্ছে।"

"কিন্তু বৌকে যদি এবার সত্যি সত্যি ভালোবেসে ফেলে তখন তো আর আসবে না," ফিরোজাবাঈ বললো।

"হ্যাঁ, তা নাও আসতে পারে, কিন্তু একটা কথা কী জানো মা, লোকে মদের নেশা ছাড়তে পারে, আফিঙের নেশা ছাড়তে পারে, কিন্তু ঘোড়া আর বাঈজী, এ তুটোর নেশা একেবারে ছাড়তে পারে না। হাতে যখন পয়সা থাকে না তখন বৌয়ের হাতের বানানো শুকনো রুটি আর শাকও অমৃত মনে হয়, কিন্তু তারপর হাতে পয়সা এলে মাঝে মাঝে বাইরের দোকানের খাবার খেতে ইচ্ছে করে। শুনছি কুন্তীর স্বামীর অবস্থা আবার ভালো হয়ে উঠছে। যদি ও একদিন আবার এসে হাজির হয় আমি আশ্চর্য হবো না।"

ত্লারীবাঈয়ের কথা ফলে গেল। গিলে-হাতা মিহি পাঞ্জাবী পরে, মাথায় ফুলকাটা টুপি চড়িয়ে একদিন সন্ধ্যেবেলা এসে হাজির হোলো কুন্তীর স্বামী ছোটুলালজী।

তাকে দেখে ত্লারী খুশীই হোলো, গিলোরীর তসতরি তুলে নিজের হাতে রুপোলী তবক মোড়া পান খাওয়ালো ছোটুলালজীকে। তারপর খুব সহজ হাল্কা আন্তরিকতার সঙ্গে শোনালো একটি পুরোনো দিনের গান,—অব হাঁ রী ননদিয়া, পান খায় মুখ লাল কিয়ে······

বাইরের ত্-চারজন যারা ছিলো ওরা চলে যাওয়ার পর তবলিয়া সারেঙ্গিওয়ালা প্রমুখ সপরদাদের বিদায় করে দিলো ত্লারীবাঈ।

ছোটুলালজী বললো, "আমি কিন্তু এখন উঠবো না। আমি আজ সারা সন্ধ্যা তোমার এখানে বসবো বলেই এসেছি।"

ত্লারীবাঈ হেসে উত্তর দিলো, "আপনাকে আরো অনেকক্ষণ বসতে বলবো বলেই আমি সপরদাদের বিদায় করে দিয়েছি।"

খুব খুশী হোলো ছোটুলালজী। পকেট থেকে একটা বড়ো নোট বার করে থালার উপর রাখলো।

বিষণ্ণ হয়ে গেল ত্লারীবাঈয়ের মুখ। তারপর সে-ভাবটা কাটিয়ে মুখে হাসি এনে তসলীম জানালো। বললো, "বস্থন, আমি এক্ষুনি আসছি," বলে ভিতরে চলে গেল। একটু পরে যখন ফিরে এলো তখন তার হাতে একটি বড়ো চাঁদির কাজ-করা গেলাস। সেটি ছোটুলালজীর সামনে রেখে বললো, "খান। আমি নিজের হাতে তৈরী করে এনেছি।"

"কী এটা? ফালুদা? বাঃ। আমি ফালুদা খাইনি অনেকদিন। কিন্তু, একি ব্যাপার বাঈজী। তুমি চিরকাল আমায় মদ পরিবেশন করেছো। আজকে ফালুদা কেন?"

"আপনি তো মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন, ছোটুলালজী।"

ছোটুলালজী হেসে ফেললো, জিজ্ঞেস করলো, "কে বললে?"

"আপনার মুখ দেখে বুঝে নিয়েছি।"

"মদ খেলে আমার বৌ খুব মনে কষ্ট পায়। তাই তাকে কথা দিয়েছি যে আর মদ ছোঁবো না। আজকাল আর খেতে ইচ্ছেও করে না।"

"আপনি যে আমার কাছে এসেছেন, এতে আপনার বিবি মনে কষ্ট পাবেন না?"

ছোটুলালজী অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর চোখ নামিয়ে উত্তর দিলো, "আমি কুন্তীকে বলেই এসেছি তুলারীবাঈ।"

তুলারীবাঈ খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো ছোটুলালের দিকে। তারপর আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, "কুন্তী কি আপনাকে বলেছে সে এক সময় আমায় চিনতো?"

"সে বলেছে যে তুমি স্কুলে তার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলে।"

কিছুক্ষণ তুলারী কোনো কথা বলতে পারলো না। ছেলেবেলার স্কুলের সেই কয়েকটি দিনের কথা তার মনে পড়লো। অনেকক্ষণ পর জিজ্ঞেস করলো, "কুন্তী ভালো আছে তো?"

"না, ভালো নেই," নিচু গলায় উত্তর দিলো ছোটুলালজী।

"কেন, কী হয়েছে ওর?" খুব উৎকণ্ঠার সঙ্গে তুলারী জিজ্ঞেস করলো।

"ও আজ সাত আট মাস বিছানায় পড়ে আছে। বিছানা ছেড়ে আর উঠতে পারবে না। পক্ষাঘাত হয়ে শরীরের ডান দিকটা চিরকালের জন্যে অসাড় হয়ে গেছে," একটু ধরা গলায় ছোটুলালজী বললো।

"আহা, বেচারী—," তুলারীবাঈয়ের চোখ তুটো ছলছল করে উঠলো, "ও জীবনে অনেক কষ্ট পেয়েছে, আর কেন?"

ছোটুলালজী পকেট থেকে একটি সোনার চিরুনী বার করে তুলারীকে দিলো। বললো, "এটা কুন্তীর। ও পাঠিয়ে দিয়েছে তোমার জন্যে।"

দুলারী চিরুনীটা বুকে চেপে ধরলো, তারপর সেটি ঠোঁটে ঠেকিয়ে চুমু খেয়ে নিজের কবরীতে গুঁজে দিলো।

ছোটুলালজী বললো, "আজ বিকেলে কুন্তী আমায় বললে, দেখ, তুমি প্রত্যেকদিন কাজ থেকে ফিরে এসে শুধু আমারই কাছে সারা সন্ধ্যে বসে থাকো, এ আমার ভালো লাগে না। এতে আমার কষ্ট বাড়ে। মাঝে মাঝে একটু গান শুনতে যেও, তাতে তোমার মন ভালো থাকবে, আমিও সুখ পাবো। দুলারী আছে, ওর কাছেই তুমি যেও মাঝে মাঝে, সেও খুশী হবে। যদি ও কিছু বলে, ওকে বোলো যে আমি তোমায় অনেক বলে কয়ে ওর কাছে পাঠিয়েছি।"

দুলারীবাঈয়ের চোখ দিয়ে দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো।

ছোটুলালজীর কথা ফিরোজাবাঈকে বলছিলো দুলারী।

"আমার প্রথমটা এমন রাগ হোলো কুন্তীর উপর! তুমি চিরকালের জন্যে বিছানা নিয়েছো বলে তোমার স্বামীকে পাঠিয়ে দিলে আমার কাছে? কই, আগে যখন সে আসতো, তখন তো তুমি মনে সুখ পেতে না সে-কথা জেনে? তারপর ভাবলাম, বেচারী কুন্তী! ওর ওপর কী রাগ করবো। ও বুদ্ধিমান মেয়ে। যেদিন বিছানা নিয়েছে, সেদিনই বুঝেছে যে স্বামীকে খুব বেশীদিন আর ঘরে ধরে রাখতে পারবে না। তাই নিজের থেকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে স্বামীকে আমারই কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। আমি ওর ছেলেবেলার বন্ধু, তাই ও এটুকু ভরসা করছে যে আমি ওর স্বামীকে খানিকটা সামলে রাখতে পারবো। তা-নইলে সে যদি অন্য কোথাও যায়, তার স্বভাব একেবারে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।"

ফিরোজাবাঈ ব্যাপারটা অন্যভাবে বুঝলো। বললো, "ভালোই করেছে। যে-টাকা অন্যের বাড়িতে যেতো সে-টাকাটা আমার বাড়িতেই আসবে।"

মায়ের কথা শুনে তুলারীর সমস্ত শরীর জ্বলে গেল। মায়ের কথার কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলো। তারপর উঠে পড়ে বললো, "আমি ভাবছি, আগের জন্মে কতো পাপ করলে হিন্দুস্তানে মেয়ে হয়ে জন্মাতে হয়," বলে রাগে গরগর করতে করতে বেরিয়ে চলে গেল।

একদিন ফিরোজাবাঈয়ের মনে হোলো তুলারী হয়তো কাউকে নিয়ে ঘর করতে পারছে না বলেই তার মন এত অশান্ত। একসময় তুলারী কাছে এসে বসতে তার কাছে কথাটা তুললো।

শুনে তুলারী আস্তে আস্তে মাথা নাড়লো। বললো, "তুমি যে ভাবে ঘর করার কথা বলছো সে-ভাবে কারো সঙ্গে ঘর করতে আমার ভালো লাগে না। সিংদেওজী তো চেয়েছিলো একসময়। আমি রাজী হই নি আমি কারো বাঁদীগিরি করতে পারবো না।"

"সিংদেওজী তো কখনো সখনো আসে এখানে ?"

ফিরোজাবাঈ জানতো না। তুলারীবাঈ বললো, "উনি এখন বোম্বেতে থাকেন। ব্যবসা করছেন সেখানে, স্টেট্ থেকে যে মাসোহারা পেতেন তাতে তো আজকাল আর চলে না। কলকাতায় আসেন মাঝে মাঝে। এলেই এখানে আসেন।"

"আর কোথাও যায় না, শুধু এখানেই আসে ?"

"অন্য কোথাও যায় কিনা সে খবর রাখিনা, তবে কলকাতায় যখনই থাকে, প্রায় প্রত্যেকদিনই এখানে আসে," উত্তর দিলো তুলারীবাঈ।

"সিংদেওজী এখন আর বলে না ?"

"কি ?" চোখ তুলে তাকালো তুলারী। "ও—।" বুঝলো সে। বললো, "এখন আর বলবার সাহস নেই। তবে আমায় ভালো-বাসে খুব।"

"তা হলে ?"

মায়ের প্রশ্ন শুনে দুলারীবাঈ হাসলো। বললো, "মা, টাকার জন্যে মুজরা করতে পারি। কিন্তু টাকার জন্যে কাউকে প্যার করতে পারবো না।"

দুলারীর কথা শুনে তেতে উঠলো ফিরোজাবাঈ, "হুঁঃ, মেয়ের কথা শোনো। টাকার জন্যে প্যার করতে পারবো না! যাও, তাহলে রাস্তার মোড়ের ওই জগবন্ধু পানওলাকে প্যার করো গে যাও।"

মায়ের মুখে রূঢ় কথা শুনে দুলারীবাঈয়ের চোখ ছলছল করে উঠলো। কিন্তু তবুও হেসে ফেললো সে। বললো, "যদি জগবন্ধু পানওলাকে কোনোদিন প্যার করতে পারি তাকে এখানে এনে রাজা করে রাখবো, বলে দিচ্ছি।"

"আমি বিছানায় পড়ে আছি, তাই," রাগ করে বললো ফিরোজাবাঈ, "তা নইলে আমি একবার দেখতাম তুমি কাকে প্যার করো আর কাকে বাড়িতে এনে রাজা বানিয়ে রাখো।"

দুলারী হাসতে লাগলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা মা, এখন না হয় জমিদারদের পয়সা শেষ হয়ে আসছে, রাজা মহারাজা নবাবদের দেখা যায় না। কিন্তু কোনো এক জমানায় রাজা মহারাজা নবাব জমিদার তুমি তো কিছু দেখেছো। তাদের দৌলতের কতো কাহিনী শুনেছি তোমার কাছে। ত্রিবেদীজীর তো এমন কিছু টাকা ছিলো না সেই সব নবাব জমিদারদের মতো, যারা তোমার কাছে আসতো। তুমি কি ত্রিবেদীজীকে প্যার করেছিলে ওঁর টাকার জন্যে ?"

ফিরোজাবাঈ চুপ করে রইলো একটুখানি, তারপর কেঁদে ফেললো।

"উনি তো আমার খোঁজখবরও খুব করতেন তা-নয়, মাঝে-মাঝে আসতেন, এই পর্যন্ত," বলে গেল দুলারীবাঈ।

ফিরোজাবাঈ কোনো উত্তর দিলো না।

"তুমি ওঁর কাছে কি পেয়েছো মা?"

চোখের জলের মধ্যে মুখে একটু স্নিগ্ধ হাসি দেখা দিলো। ফিরোজাবাঈ বললো খুব মিষ্টি গলায়, "তোমায় পেয়েছি, ছুলারী।"

চোখের চাউনি দিয়ে ছুলারীর মনে অফুরান স্নেহ ঢেলে দিলো ফিরোজাবাঈ, ঠিক সেই ছেলেবেলার মতন। ছুলারীর খুব ভালো লাগলো। সে মাকে অনেকদিন এরকম দেখেনি। আস্তে আস্তে মায়ের পাশে শুয়ে পড়ে মাকে জড়িয়ে ধরে মায়ের বুকে মুখ লুকোলো।

এই তার প্রথম মায়ের মুখে পিতৃপরিচয় পাওয়া। তার সমস্ত শরীর এক অব্যক্ত পুলকে শিউরে শিউরে উঠলো।

অনেকক্ষণ পর ছুলারী জিজ্ঞেস করলো, "আরও অনেক কিছু পেয়েছো মা, আমায় বলছো না।"

"কি পেয়েছি রে?"

"অনেক ছুঃখ পেয়েছো," বললো ছুলারী।

ফিরোজাবাঈ একটু হাসলো। ছুলারীর মাথায় হাত বুলিয়ে বললো, "ছুলারী, আমার সে ছুঃখের দাম লাখ টাকা।"

ছুলারী বিছানার উপর উঠে বসলো। আঙুল নেড়ে হাসিমুখে বললো, "তাহলে আমি যদি বলি আমি টাকার জন্যে কাউকে প্যার করতে পারবো না, তুমি আমার উপর রাগ করো কেন?"

ফিরোজাবাঈয়ের চোখ ছুটো সজল হয়ে উঠলো। বললো, "আমি চাইনা যে আমার মতো ছুঃখ তুমি পাও।"

"তার দাম লাখ টাকা হলেও নয়," হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলো ছুলারী।

ফিরোজাবাঈ কোনো কথা না বলে শুধু মাথা নাড়লো।

আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল ছুলারীর মুখের হাসি। চোখ ছুটো ঝাপসা হয়ে গেল। বললো, "মা—!"

"কী ?"

"ত্রিবেদীজী এখন কোথায় ?"

উত্তর দিতে পারলো না ফিরোজাবাঈ। ঠোঁট কামড়ে রইলো। শুধু আঙুল তুলে আকাশের দিকে দেখিয়ে দিলো।

তুলারী পাথর হয়ে বসে রইলো। আস্তে আস্তে সন্ধ্যা হয়ে এলো। জান্‌কী এসে ঘরের আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। নিত্ত-নৈমিত্তিক চাপা শোরগোল শুরু হোলো সামনের রাস্তায়।

জানলার ওধারে দূরের বৌবাজার স্ট্রীটে তখন এদিক ওদিক ছুটে চলে যাচ্ছে অগণ্য ট্রাম বাস মোটর। কাতারে কাতারে লোক চলেছে শেয়ালদার দিকে। হু-হু করে মোটর ছুটে যাচ্ছে অন্যদিকে সেণ্ট্র্যাল এভিনিউ দিয়ে।

"উনি মারা গেছেন কদিন হোলো ?"

বছর তুয়েক আগে একটি দিন। সেদিনের কথা এখনো মনে আছে তুলারীর।

সকালবেলা লছমীপ্রসাদজী বলেছিলো কোথায় যেন তাকে গান গাইতে ডাকা হয়েছে। তার সঙ্গে খুব ঝগড়া করেছিলো তুলারী। মায়ের নামে একটি চিঠি নিয়ে এসেছিলো একটি লোক। সে চিঠি নিয়ে ফিরোজাবাঈ নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকেছিলো।

তুলারীর তখন মেজাজটা খুব উত্তপ্ত হয়ে ছিলো। সে গিয়ে খোঁজ নেয়নি কী ব্যাপার।

তুপুরে খেতে বসে শুনলো লছমীপ্রসাদজী খাবে না, ওর খিদে নেই।.

না খাক সে, ভারী বয়ে গেল—ভাবলো তুলারী।

তারপর শুনলো ফিরোজাবাঈও খাবে না, শরীর ভালো নেই।

বাঃ, এ বাড়িতে কেউ খায় না, কারো বা ক্ষিদে নেই, কারো শরীর খারাপ,—ভাবলো তুলারী,—শুধু আমারই শরীর ভালো, আমারই মন কিছু হয় না, আমারই রাগ নেই কিছু নেই, ভেবে

সবার উপর রাগ করে দুজনের খাবার একলা খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লো সে।

বিকেলবেলা আবার ভাব হয়ে গেল লছমীপ্রসাদজীর সঙ্গে। দুজনে মিলে গান গাইতে বসলো।

একবার জান্‌কীকে জিজ্ঞেস করলো, মা কোথায়? জানকী জানালো ফিরোজাবাঈ নিজের ঘরে একলা চুপচাপ বসে আছে।

লছমীপ্রসাদ আর দুলারীবাঈ গান গাইলো রাত্তিরে অনেকক্ষণ অবধি। নিচে সদর দরজা আগের থেকে বন্ধ করে রাখা হয়েছিলো। সুতরাং বাইরের আর কেউ সেদিন এলো না। বেশ নিরিবিলি বসেছিলো দুজনে।

তারপর দিন লক্ষ্য করলো ফিরোজাবাঈ সবাইকে বড্ড বকাবকি করছে। সামান্য কারণে যার তার উপর রাগ। অসময়ে রেওয়াজ করতে বসলে দুলারীর উপর রাগ, দুপুরে বেশীক্ষণ ঘুমোলে জান্‌কীর উপর রাগ, দুলারী কোথাও মুজরার বায়না প্রত্যাখ্যান করলে লছমীপ্রসাদজীর উপর রাগ, খালি রাগ আর রাগ আর হরদম বকাবকি।

মা কী হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন—ভাবতো দুলারী।

তারপর শরীর অসুস্থ হয়ে পড়লো ফিরোজাবাঈয়ের। বাতের ব্যথায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়লো, তার উপর লিভারের ব্যথা, বুকের ধড়ফড়ানি, প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় অসহ্য মাথাব্যথা, সব সময় এরকম একটা না একটা কিছু।

সেদিন যে মায়ের ব্যথার ভাগ নিতে পারেনি,—আজ সে কথা ভেবে ভেবে দুলারীর চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগলো।

কয়েকদিন মায়ের সঙ্গে খুব ভাব হোলো দুলারীর, কিন্তু সেই ভাব খুব বেশীদিন রইলো না।

একদিন ফিরোজাবাঈ তুলারীকে ডেকে পাঠালো।

তুলারী ঘরে ঢুকতে জিজ্ঞেস করলো, "জান্‌কী বলছিলো তুমি নাকি বেকবাগানের ইফতিকার সাহেবের বাড়ির মুজরার বাঁড়া নিতে চাও নি। ওদের লোককে ফিরিয়ে দিয়েছো?"

"হ্যাঁ," স্বীকার করলো তুলারীবাঈ।

"ওরা তো অনেক টাকা দিতে চেয়েছিলো।"

"হ্যাঁ।"

"তবু রাজী হওনি?"

"না।"

"কেন?"

"এমনি। আমার ভালো লাগে না। ঠিক করেছি বাইরে হপ্তায় একটির বেশী মুজরা করবো না।"

"ব্যস্?"

"হ্যাঁ।"

"আর বাড়িতে?"

"তাও বেশী করবো না। শুধু চেনাজানা যারা আসবে তাদের জন্যে করবো, বাইরের লোকের জন্যে নয়। যদি খোলা-মুজরা করি তো হপ্তায় একদিন। তার বেশী নয়।"

ফিরোজাবাঈ অবাক হয়ে গেল। মেয়েটির মাথা খারাপ হোলো নাকি? জিজ্ঞেস করলো, "তারপর? এত খরচা চলবে কি করে?"

"খরচা কমিয়ে দেবো," তুলারী উত্তর দিলো। "এত খরচা করে কী লাভ? সোনাদানা যা আছে তা ভেঙে সাদাসিধে ভাবে সারাজীবন কোনোরকমে কাটিয়ে দেওয়া যাবে।"

রাগে লাল হয়ে গেল ফিরোজাবাঈ। বললো, "তোমার না হয় কাটবে, কিন্তু রোশনীর কী হবে?"

রোশনী—তুলারীর ছোটো বোন। তার তখন বছর দশ-

এগারো বয়েস। দুলারীর মতো অতো সুন্দর আর ফরসা নয়, কিন্তু খুব মিষ্টি দেখতে। সারা মুখে মস্তো বড়ো বড়ো দুটো চোখ, আর মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল।

ওর বয়েসে দুলারী ছিলো অনেক শান্ত, গম্ভীর, চুপচাপ। নিজের মনে খেলতো, কারো সঙ্গে বেশী মিশতে চাইতো না, জানলার কাছে বসে দূর রাজপথের যানবাহন আর পথিকের দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালোবাসতো।

কিন্তু রোশনী খুব চঞ্চল, খুব দুষ্টু। কারো কথা শুনতো না, ঘরময় দাপাদাপি ছুটোছুটি করে বেড়াতো। সময়ে অসময়ে ছুটে যেতো আশেপাশের বাড়িতে, ভাব করতো ছোটো বড়ো সবার সঙ্গে। কোথাও চুপ করে দশ মিনিট বসে থাকতে পারতো না।

পড়াশুনোয় তার তেমন মন ছিলো না, তবু দুলারী প্রত্যেকদিন সকালবেলা তাকে জোর করে নিজের কাছে বসিয়ে তার অক্ষর পরিচয় করিয়েছিলো। তারপর যখন একটু বড়ো হোলো, ফিরোজাবাঈ গিয়ে বললো, "রোশনীকে কোনো স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেবো ভাবছি।"

দুলারীর স্কুল ছেড়ে চলে আসার ঘটনাটা ফিরোজাবাঈ জানতো। সেই কথা মনে পড়লো বোধ হয়। একটু চুপ করে থেকে বললো, "স্কুলে দিয়ে কী হবে। ওর তেমন পড়াশুনোয় মন আছে বলে মনে হয় না। তার চেয়ে এবার একটু একটু নাচ আর গান শিখুক। আর পড়াশুনো যদি এক আধটু করতে চায় বাড়িতে কোনো মাস্টার রেখে দিলে হবে, তোমার যেমনি রেখেছিলাম।"

দুলারীর মুখ রাগে রাঙা হয়ে উঠলো। বললো, "বাড়িতে মাস্টার রেখে কোনো দরকার নেই। তাতে কিছু পড়াশুনো হয় না। আর নাচ-গান শিখিয়েও কোনো দরকার নেই।"

"নাচ-গান শিখিয়ে দরকার নেই কিরকম," তেড়ে উঠলো ফিরোজাবাঈ, "বড়ো হলে ওর চলবে কি করে?"

"দেখ মা," দুলারী তেতে উঠে বললো, "তোমার মা মুজরা-ওয়ালী ছিলো, তুমি মুজরাওয়ালী আছো, আমি মুজরাওয়ালী আছি। ব্যস, অনেক হয়েছে, আর নয়। আমার বোন, আমার মেয়ে, আমার মেয়ের মেয়ে, ওদের কাউকে আর মুজরা করে পয়সা কামাবার দরকার নেই।"

"বাঈজীর মেয়ে বাঈজী হবে না তো কি বাদশাজাদার বিবি হবে নাকি?" তেড়ে উঠলো ফিরোজাবাঈ।

"আচ্ছা মা," বললো দুলারী, "আমাদের ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই? আমাদের সবার জিন্দগী কি চিরকাল এমনি চলবে?"

মায়ের কোনো আপত্তি দুলারী শুনলো না, রোশনীকে নিয়ে একটি কনভেণ্টে ভর্তি করিয়ে দিলো সিংদেওজীর সহায়তায়। তাকে বাড়িতেও থাকতে দিলো না। বললো, এই বাতাবরণে থেকে ওর কোনো দরকার নেই। তাকে দিয়ে এলো সেই কনভেণ্টের হোস্টেলে।

নাচ-গান শিখবে না?—না, নাচ-গান শেখার দরকার নেই, বললো দুলারী। স্কুলে পিয়ানো শিখবে, ইংরেজী গান শিখবে, তাই যথেষ্ট।

"আরে, ও একেবারে ইংরেজ বিবি বনে যাবে যে," আশঙ্কা প্রকাশ করলো ফিরোজাবাঈ, "আমাদের যে পরে আর চিনতে চাইবে না।"

দুলারী উত্তর দিলো, "ও যদি আমাদের ভুলে যেতে পারে, তাতে আমাদের কোনো ক্ষতি নেই, বরং ওরই লাভ।"

ফিরোজাবাঈয়ের কোনো আপত্তি টিকলো না।

তারপর আজ যখন রাগে লাল হয়ে ফিরোজাবাঈ বললো,— "তোমার না হয় কাটবে। কিন্তু রোশনীর কী হবে,"—দুলারী উত্তর দিলো, "রোশনীর জন্যে ভাবনা কী? ও পড়াশুনা করবে, তারপর ওর একটা বিয়ে দিয়ে দেবো।"

অক্ষম রাগে ফিরোজাবাঈ কেঁদে ফেললো। দুলারী কি বুঝেও বোঝে না? রোশনী বাঈজীর মেয়ে, তাকে বিয়ে করবে কে?

"আমরা তো আর দশজনের মতো বুদ্ধু নই যে জাত মিলিয়ে জনম্‌পত্রি মিলিয়ে মেয়ের শাদী দিতে হবে। গরীবের ঘরের অনেক ভালো ছেলে আছে। বিয়ে দিতে হলে গরীবের ঘরে। সেখানে বৌয়ের ইজ্জত থাকে। যে লোক দিন আনে, দিন খায়, সে বিবিকে প্যারও করে। যদি পড়াশুনায় ভালো গরীবের ছেলে পাই, রোশনীকে আর ওর বরকে বিলেত পাঠিয়ে দেবো," জানলা দিয়ে তাকিয়ে স্বপ্নাতুর চোখে দুলারী বললো।

"বিলেত!" আকাশ থেকে পড়লো ফিরোজাবাঈ, "অতো টাকা আসবে কোত্থেকে?"

দুলারীবাঈ হাসলো। বললো, "মা, আমি যদি সত্যি সত্যি খুব টাকা রোজগার করতে চাই, আমার অসুবিধে কি বলো?"

দুলারীর দিকে অবাক হয়ে তাকালো ফিরোজাবাঈ। বললো, "নিজের জন্যে তুমি টাকা কামাতে চাও না, তোমার এসব ভালো লাগে না, অথচ বোনের জন্যে তোমার টাকা কামাতে আপত্তি নেই?"

"না, মা, নেই," আস্তে আস্তে বললো দুলারী, "যদি আমার জিন্দগীর দাম দিয়ে আমার বোনের জন্যে নতুন রাস্তা তৈরী করে দিতে পারি, আমার কোনো দুঃখ থাকবে না, আমার কোনো কষ্টই কষ্ট বলে মনে হবে না।"

দুলারীর কথা শুনে ফিরোজাবাঈ বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে লাগলো।

সে আজ অসুস্থ, তার নিজের রোজগার করার ক্ষমতা নেই, মেয়ের রোজগারে চলতে হয়, সে জন্যেই তার এই দুর্গতি, এসব কথা বার বার শোনালো দুলারীকে। তা নইলে সে কাউকে এরকম খামখেয়ালী করে রোশনীর ভবিষ্যত এ ভাবে নষ্ট করতে দিতো না।

মায়ের কথা কানে তুললো না দুলারীবাঈ। আস্তে আস্তে নিজের মনে গিয়ে গান ধরলো জানলার কাছে দাঁড়িয়ে।

দুলারী বাড়িতে খোলা মুজরা করা প্রায় বন্ধ করে দিলো। বাইরে মুজরার বীড়া নেওয়াও কমিয়ে দিলো। উঠে পড়ে লাগলো ওস্তাদ ছোটে বরকতউল্লা সায়েবের কাছে খেয়াল শিখবার জন্যে।

ফিরোজাবাঈ জান্‌কীকে বললো, "আমার এই মেয়েটার জিন্দগী একেবারে বরবাদ হয়ে গেল। আমার নসীব, এমন বেওকুফ্ মেয়েও পেটে ধরেছিলাম। গানের নেশায় পেয়ে বসেছে তাকে। গানের নেশা বড়ো সাংঘাতিক নেশা জান্‌কী, মদের নেশার থেকেও খারাপ। লোকে এর জন্যে সব কিছু ছাড়তে পারে।"

সাত

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলো তুলারীবাঈ। কিন্তু বেশীক্ষণ ঘুম হোলো না। একঘণ্টাও না। বৌবাজার দিয়ে একটা মিছিল চলেছে স্লোগান দিতে দিতে। তুলারীবাঈয়ের ঘুম ভেঙে গেল।

মনে হোলো যেন মাথা ধরাটা একটু কমেছে। গায়ে হাত দিয়ে দেখলো। কি বুঝলো কে জানে, বার বার নিজেকে বললো, নাঃ, তেমন জ্বর নেই তো, এখন কমে যাচ্ছে একটু একটু করে।

না, আজ নয়। তার যতো অসুখ হবে হোক, যখন হবে হোক, আজ নয়। অন্তত আজকের একটি সন্ধ্যা নয়।

ঘুম আর এলো না। তবু চোখ বুঁজে নিস্পন্দের মতো বিছানায় লেপ্টে রইলো তুলারীবাঈ।

তার মন আবার ফিরে গেল সেই পুরোনো দিনগুলোতে।

তুলারীবাঈ বাড়িতে খোলা মুজরা করা প্রায় বন্ধ করে দিলো। বাইরে মুজরায় বীড়া নেওয়াও কমিয়ে দিলো। উঠে পড়ে লাগলো ওস্তাদ ছোটে বরকতউল্লা সায়েবের কাছে খেয়াল শিখবার জন্যে।

নতুন লোক কেউ বড়ো একটা আসে না। পুরোনো যারা ছিলো তারাই আসে। তারাই মাঝে মাঝে তাদের কোনো বন্ধুবান্ধবকে নিয়ে আসে। সেই নতুন লোকেরা আস্তে আস্তে পুরোনো হয়ে আসে।

মাঝে মাঝে আসে কুন্তীর স্বামী ছোটুলালজী।

তিন-চার মাস অন্তর এক একদিন সিংদেওজী এসে পড়ে।

মুজরার বায়না আসে বাঙালী জমিদারবাবুদের বাড়ির বিয়েতে, অন্নপ্রাশনে, কিংবা কারো কোনো ব্যক্তিগত উপলক্ষে। মাঝে মাঝে আমন্ত্রণ আসে অবাঙালী ব্যবসায়ীদের বাগানবাড়িতে।

রোজগার যা হয় তাতে সব প্রয়োজন মিটে যায়। কোনো অভাব নেই। একটু একটু অশান্তি আসে খুঁটিনাটি নিয়ে, তবে সে-সব সামলানো যায়।

দিন কাটতে লাগলো এমনি করে।

এমন সময় একদিন দেখা হোলো গুপ্ত সায়েবের সঙ্গে।

কলকাতার নামকরা এটর্নি রমাপতি গুপ্ত।

লক্ষপতি লোক, শহরের অভিজাততম পাড়ায় রাজপ্রাসাদের মতো বাড়ি। পঞ্চাশের উপর বয়েস।

এমনি খুব সায়েবিয়ানা, স্যুট ছাড়া চলেন না, ইংরেজি ছাড়া বলেন না। মুখে সব সময় দামী সুগন্ধী চুরুট।

কিন্তু একটি মস্তো বড়ো দুর্বলতা—উচ্চাঙ্গ সংগীত ভালোবাসেন খুব। সে সময়টা তখনো এতো মিউজিক কনফারেন্সের প্রচলন হয় নি। ভালো গান শোনা যায় সাধারণত অভিজাত রসিক মহলে ঘরোয়া আসরে।

গুপ্ত সায়েবের এক সঙ্গীতরসিক মক্কেল ছিলো। কোথাকার যেন খুব বড়ো জমিদার। কলকাতায় মস্তো বড়ো ব্যবসাও আছে।

সে একদিন বললো, "ভালো ঠুমরি শুনতে চান তো দুলারী-বাঈয়ের গান শুনুন। ওর মা ফিরোজাবাঈ খুব ভালো গাইতো। মেয়ে মায়ের চাইতেও ভালো গায়।"

দুলারীবাঈয়ের দুটো তিনটে গানের রেকর্ড কিনে আনলেন গুপ্ত সায়েব। সেগুলো শুনলেন। তারপর সেই মক্কেল অনন্ত পাকড়াশীর সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় শোনা যায় এই বাঈজীর গান?"

"ওর বাড়ি গিয়ে শুনে আসতে পারেন," বললো অনন্ত পাকড়াশী।

"না, না," শিউরে উঠলো গুপ্ত সায়েব, "গান শোনবার জন্যে বাঈজীর বাড়ি যেতে পারবো না।"

"তাহলে বাড়িতে মুজরা করতে ডাকুন।"

"আমার বাড়িতে!" অনন্ত পাকড়াশীর কথা শুনে গুপ্ত সায়েব স্তম্ভিত হলেন। এমন ভাবে তাকালেন তার দিকে যে অতো বড়ো ছঁদে জমিদার এবং ব্যবসায়ী অনন্ত পাকড়াশীর যেন মনে হোলো এরকম একটা কথা বলা ঠিক হয়নি।

তবে অনন্ত পাকড়াশী মনে মনে হাসলো। রমাপতি গুপ্তের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে নিন্দুকেরা যে দু-চার কথা বলে না এমন নয়।

"আচ্ছা, আমার বাড়িতেই একদিন মাইফিল হবে," বললো অনন্ত পাকড়াশী, "দুলারীবাঈজীর গান সেখানেই শুনতে পাবেন।"

ঈস্টারের ছুটির সন্ধ্যায় অনন্ত পাকড়াশীর বাড়িতে মাইফিল বসলো। সেখানে মুজরা করতে এলো দুলারীবাঈ।

আসরে বসেই সে লক্ষ্য করলো গুপ্ত সায়েবকে।

সবাই ফরাশের উপর বসেছে। গুপ্ত সায়েব বসেছেন একপাশে এক কৌচে। বসে চুপচাপ চুরুট টানছেন গম্ভীর মুখে। ভাবখানা যেন, তিনি এই পরিবেশের লোক নন, এসবের অনেক উঁচুতে বিরাজ করেন, এখানে এসে তিনি আসরে উপস্থিত সবাইকে কৃতার্থ করেছেন।

দুলারী মনে মনে হাসলো। এ ধরনের লোক দু-চারজন সে যে দেখেনি তা নয়। গুপ্ত সায়েবের চোখ দুটি আধবোঁজা। কিন্তু দুলারী ঠিক জানে যে ওই আধবোঁজা চোখের পাতার ফাঁক দিয়ে ওই সম্ভ্রান্ত লোকটি লক্ষ্য করছে তার দেহ গঠনের খুঁটিনাটি জ্যামিতি।

তুলারীর একটু দুষ্টুমি করবার ইচ্ছে হোলো। সে গুপ্ত সায়েবের দিকেই কটাক্ষ করে ভাও দিয়ে গান ধরলো—লগত করেজোয়া মে চোট···, আমার কলিজায় আঘাত লাগছে···, ফুল গেঁদোয়া ন মারো রাজা···, ও-রাজা তুমি ফুলের তোড়া দিয়ে আমায় মেরো না···, এ্যায়সো বেদরদী দরদিয়া ন জানে···, এমন বেদরদী দরদের কিছু জানে না···, মারত পলকিয়া কি ওট···, দৃষ্টি ফেরানোর সঙ্গে সঙ্গেই আবার মেরে দিচ্ছে···।

গান শুনে সবাই খুব তারিফ করলো। শুধু গুপ্ত সায়েব চুপ করে বসে রইলেন নির্বিকার মুখে।

গান শেষ হতে গুপ্ত সায়েব বললেন, "বেশ তৈরী গলা তোমার। ধ্রুপদ খেয়াল গাও না কেন?"

"কেউ ফরমাশ করেনা বলেই গাই না", উত্তর দিলো তুলারী।

"জানো?"

"সামান্য কিছু শিখেছি।"

"কার কাছে শিখেছো?"

নাকে কানে হাত দিয়ে তুলারীবাঈ বললো, "আমার ওস্তাদ হলেন মিঞা ছোটে বরকতউল্লা খান সাহেব।"

"মিঞা ছোটে বরকতউল্লার ছাত্রী তুমি? আ—চ্ছা—! বেশ, বেশ। একটি খেয়াল গাও তো শুনি—।"

"এসব জায়গায় গাইবার জন্যে খেয়াল নয়," তুলারী আস্তে আস্তে বললো, "খেয়াল আমি শুধু বাড়িতে গাই, আর নিজে একলা বসে গাই।"

"ও। আচ্ছা।"

আর কিছু বললেন না গুপ্ত সাহেব।

মাইফিল চললো পুরোদমে। আরো কয়েকটি গজল আর দাদরা গেয়ে শোনালো তুলারীবাঈ।

আসর ভাঙবার পর গুপ্ত সায়েব কারো দিকে ফিরেও তাকালেন

না, তুলারীবাঈয়ের দিকেও না, অন্যান্য অভ্যাগতদের দিকেও না। অনন্ত পাকড়াশীর সঙ্গে একটা দুটো কথা বলে নিজের দামী গাড়িতে চেপে বাড়ি ফিরে গেলেন।

দিন কয়েক পরের কথা।

তুলারীবাঈ বাইরের ঘরে বসে তবলচির সঙ্গে রেওয়াজ করছিলো।

এমন সময় অনন্ত পাকড়াশীর সঙ্গে এসে উপস্থিত হলেন গুপ্ত সায়েব। এবার আর সাহেবী পোশাক নয়। এবার পরনে কোঁচানো ধুতি, চুনট করা পাঞ্জাবি, গায়ে শাল, মুখে চুরুট, হাতে হাতির দাঁতের লাঠি।

অসময়ে আগন্তুক দেখে তুলারীবাঈ বিস্মিত হোলো। বললো, "এ সময়ে তো আমি—"

সে কথা শেষ করবার আগেই গুপ্ত সায়েব বললেন, "আমি তোমার খেয়াল শুনতে এসেছি।"

তুলারী গুপ্ত সায়েবের চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলো। বুঝলো যে, খেয়াল শোনবার আগ্রহ খুবই আন্তরিক বটে, কিন্তু পঞ্চাশোত্তর এটর্নির চোখে যে-দৃষ্টি সে শুধু খেয়ালের নেশা নয়।

খুব গম্ভীর গলায় তুলারী বললো, "এখন নয়, সন্ধ্যের পর আসবেন।"

"কিন্তু সন্ধ্যের পর আসা তো আমার মতো লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। আমাকে অনেকেই চেনে। এ পাড়ায় কেউ যে আমায় দেখে চিনতে পারবে, সে আমি চাই না।"

"সন্ধ্যের পর আসবেন," বলে তুলারীবাঈ উঠে পড়লো।

মুখ লাল করে চলে গেল রমাপতি গুপ্ত।

মনে মনে খুশী হোলো অনন্ত পাকড়াশী।

দুলারী বেশী মাথা ঘামায় নি। সে জানতো যে গুপ্ত সায়েব আসবে।

গুপ্ত সায়েব এলো। দিন দুই পর একদিন সন্ধ্যেবেলা এলো। এসে, গান শুনে চলে গেল। এলো তার পরদিন সন্ধ্যায়, তার পরদিনও।

একদিন বললো, "দেখ দুলারী, তুমি যে টাকার জন্যে অন্য লোককে গান শোনাবে, এ আমার ভালো লাগছে না। তুমি সারাদিন মন দিয়ে গান শেখো, রেওয়াজ করো, আর সন্ধ্যেবেলা গান শুনিও আমায়।"

"কিন্তু মুজরা না করলে আমার চলবে কি করে," জিজ্ঞেস করলো দুলারীবাঈ।

গুপ্ত সায়েব কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো দুলারীর দিকে। তারপর মুখ ফিরিয়ে কি যেন ভাবলো। ভেবে বললো, "তোমার মাসে কতো চাই বলো।"

দুলারীবাঈ মুখ নিচু করে হাসলো। মনে মনে ভাবলো, মা শুনলে খুশী হবে।

গুপ্ত সায়েব ভাবলো দুলারী হয়তো একটু ইতস্তত করছে। বললো, "কতো চাই তোমার? টাকার জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না।"

দুলারী চোখ তুলে জিজ্ঞেস করলো, "আপনি যদি প্রত্যেকদিন সন্ধ্যা এখানে কাটিয়ে যান, আপনার বাড়ির লোকের অসুবিধে হবে না?"

ওর কথা শুনে গুপ্ত সায়েব হাসলো। বললো, "আমার স্ত্রী বুড়ি হয়ে গেছে। ওর চোখে আমিও বুড়ো হয়ে গেছি। সুতরাং কারো কোনো অসুবিধে হবে না।"

দুলারী কোনো উত্তর দিলো না।

গুপ্ত সায়েব বলে গেল, "যদ্দিন তুমি আমায় প্রত্যেকদিন গান

শোনাবে তদ্দিন আমার কাছে আমি বুড়ো হবো না। এখন আমায় শুধু বলো, মাসে কতো টাকা পেলে তুমিও আমাকে বুড়ো মনে করবে না।"

ছুলারীর গা ঘিনঘিন করে উঠলো। তবু রাজী হয়ে গেল। বললো একটা খুব মোটা টাকার অঙ্ক।

ভাবলো, বাইরে মুজরা করা যদি বন্ধ করতে হয়, তাহলে এরকম একটি অবলম্বন না হলে নয়।

কেটে গেল তিন মাস, চার মাস, ছয় মাস।

গুপ্ত সায়েব গানের সত্যিকারের সমঝদার বটে, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বোঝা গেল যে সে শুধু গানের জন্যেই আসে না, সে আসে একথা ভুলে যেতে যে তার বয়েস বেড়ে যাচ্ছে। তার দেহগঠনে, মুখের রেখায়, চুলের রঙে যে বয়েসের ছাপ, তাতে গুপ্ত সায়েবের আপত্তি নেই, কারণ এসবের একটা সামাজিক ও পেশাদারী সুবিধে আছে। তাই তিনি চুলেও কলপ দেন না, ভুঁড়িও কমাবার চেষ্টা করেন না, রাত্রিবেলা লুকিয়ে মুখে ক্রীম মাখেন না মুখের রেখা দূর করবার জন্যে। বয়েসের রাশভারী চেহারার প্রয়োজন আছে সামাজিক ক্ষেত্রে, পেশার ক্ষেত্রে। সামাজিক ক্ষেত্রে তিনি তিন মেয়ের বাবা, যাদের ছুজন ছুলারীর চাইতে বড়ো, একজন সুপরিচিতা সমাজসেবিকার স্বামী, ছুই ছেলের বাবা, যাদের একজন আই-সি-এস এবং অন্যজন ব্যারিস্টার। সুতরাং অত্যন্ত সংযত, অত্যন্ত মাপা, অত্যন্ত ধীরস্থির তার কথাবার্তা, মন্থর-অচঞ্চল ভাব-ভঙ্গী।

লোকে বলে, কী ডিগনিফাইড, কী এ্যারিস্টোক্রেটিক লোক এই রমাপতি গুপ্ত। সামনে দাঁড়ালে সম্ভ্রমে মাথা নুয়ে আসে। ঘরে ঢুকলে শ্রদ্ধায় আপনা-আপনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে।

কিন্তু তার যে আর যৌবন নেই, তারুণ্য নেই, তার যে সত্যি

সত্যি বয়েস হয়েছে, এ কথায় গুপ্ত সায়েবের মন সায় দেয় না। অল্পবয়েসীদের একেবারে সহ্য করতে পারেন না। অফিসের তরুণ এ্যাটর্নিদের দাবড়ে দেন সব সময়, কারণে অকারণে। অল্পবয়েসীদের কোনোরকম প্রতিভা স্বীকার করতে চান না। সব কিছুতে তাদের কোনো না কোনো ভুল বার করেন। মানুষ বলেই মনে করেন না অল্পবয়েসীদের। শুধু হুকুম দিতে ভালোবাসেন। অল্পবয়েসীরা যে তাঁর কথায় ওঠে বসে, এটা খুব ভালো লাগে। ডাকসাইটে আই-সি-এস তাঁর বড়ো ছেলে, কিন্তু গুপ্ত সায়েবের সামনে দাঁড়ালেই তার কালঘাম ছুটতে শুরু করে। জবরদস্ত তরুণ ব্যারিস্টার তাঁর মেজো ছেলে, ইদানিং নাম করতে শুরু করেছে। কিন্তু রমাপতি গুপ্তের সঙ্গে সে চোখ তুলে কথা বলতে পারে না। লোকে যদি বলতো ও তো খুব ভালো ব্যারিস্টার, খুব নাম করছে, তিনি এমনি একটু মাথা নেড়ে দিতেন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে, কিন্তু নিজের অন্তরঙ্গদের বলতেন ও আমার ছেলে বলেই নাম করেছে। আমার ফার্ম যদি সহায়তা করে, রাস্তার ল্যাম্পপোস্টও হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করে নাম পশার করতে পারবে।

অল্পবয়েসী ছেলেদের তিনি সহ্য করতে পারেন না, কিন্তু ভালোবাসেন অল্পবয়েসী মেয়েদের। এই ভালোবাসার মধ্যেও একটা মর্যাদাবোধ আছে, শালীনতা আছে কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে মেয়েদের তিনি ভালোবাসেন খুব। নিজের ছেলেরা সামনে এসে দাঁড়াতে ভয় পায়, কিন্তু নিজের মেয়েরা আব্দার করে, শাসন করে, এবং সেটা তিনি হাসি মুখে মেনে নেন। দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, জামাই দুজনকে দেখলেই যেন তাঁর মাথায় রক্ত চড়ে যায়, কিন্তু দুই পুত্রবধূর সেবাযত্ন তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেন। নিজের ফার্মের জুনিয়ার এটর্নিদের চাইতে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে স্টেনোর জন্যে তাঁর স্নেহ অনেক বেশী। কোনো ব্যাপারে ছেলেরা চাঁদা চাইতে

এলে খেদিয়ে দেন, কিন্তু স্কুলের বা কলেজের মেয়েরা চাঁদা চাইতে এলে শূন্য হাতে তাদের ফিরে যেতে হয় না।

দুলারীবাঈয়ের কাছে এসে তাঁর সম্ভ্রম-শালীনতার সমস্ত খোলস যেন খসে পড়লো। ঘুচে গেল কথাবার্তার মার্জিত রঙ, অকুণ্ঠ হয়ে উঠলো তার কাছে।

—শোনো শোনো দুলারী, একটা গল্প বলি। জানো যখন স্কুলে পড়তাম, কলেজে পড়তাম, আমার গল্প বলার খুব নামডাক ছিলো। ছেলেরা ভিড় করে আমার গল্প শুনতো, আর হেসে গড়িয়ে পড়তো। ওসব গল্প কি আজকালকার ছেলেরা বলতে জানে? আজকালকার ছেলেরা প্রেমের কবিতা লিখতে পারে, ভালোবাসার কথা বলতে জানে, কিন্তু প্রেম করতেও জানে না, ভালোবাসতেও জানে না। আমার ফুলশয্যার রাত্তিরে বৌকে প্রথম কি বলেছিলাম জানো? ওই দেখ চাঁদ উঠেছে, এই দেখ ফুল ফুটেছে,—এসব নয়। এসব আজকালকার ছেলেরা বলে। আমি বললাম, ভাই বৌ, তুমি আমার সঙ্গে কথা বলবে না, ঘোমটা খুলবে না, এই তো? বেশ, খুলো না। প্রথম রাত্তির আজ, আমি কোনোরকম জোর-জবরদস্তি করবো না। বরং একটি গল্প শোনো। শোনালাম তাকে গল্প। সে-গল্প শুনলে সাদা দেওয়াল পর্যন্ত জবাফুলের মতো লাল হয়ে যায়, মানুষ তো কোন ছার। আমার গল্প শুনে বৌ ঠিক পাকা টইটম্বুর টম্যাটোর মতো হয়ে গেল, কিন্তু হেসে উঠলো খুকখুক করে, বললে, যাও, তুমি বড্ড অসভ্য। ব্যস, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ভাব হয়ে গেল। তাই বলছি, ভাই দুলারীবাঈ, ভুলে যাও যে আমার মাথার চুল পাকা, এসো, কাছে এসে বোসো, একটি গল্প শোনো।

দুলারীর ভালো লাগতো না। সেসব গল্প ঠাট্টা রসিকতা অল্পবয়েসী ছেলের মুখে মানায়, গুপ্ত সায়েবের মতো একজন বয়স্ক লোকের মুখে সে-সব শুনলে গা রী-রী করে। ঠিক যেন দিদিমার

বয়েসী কোনো মহিলা ঠোঁটে রঙ মেখে খেমটা নাচছে। রাগে তার কান লাল হয়ে যেতো, কিন্তু মুখে সে হাসি ফোটাতো অল্প অল্প। গুপ্ত সায়েব ভাবতো ত্নলারীবাঈ লজ্জা পাচ্ছে। সে খুশী হোতো। তার বুক ভরে উঠতো পুরুষত্বের গরিমায়।

—আচ্ছা, ত্নলারীবাঈ, তুমি বলো। আমায় দেখে তো বেশ বোঝা যায় আমার অনেক বয়েস হয়েছে। কিন্তু একজন অল্পবয়েসী ছেলের চাইতে আমি অনেক বেশী তরুণ। তাই না? আমার মধ্যে যতো প্রাণ আছে, তুমি দেখেছো অন্য কারো মধ্যে?

ত্নলারীবাঈ একটু একটু ঘাড় নাড়তো আর হাসতো। মুখে একরকম হাসি, মনে মনে অন্য রকম।

গুপ্ত সায়েবের মানবচরিত্রে খুব অভিজ্ঞতা, কিন্তু এই একটি জায়গায় এসে সে অন্ধ হয়ে গেল। ত্নলারীর একটু একটু হাসি সে তার নিজের মতো করে বুঝে নিতো, আর পরিতৃপ্ত হোতো তার পুরুষত্বের দম্ভ।

আস্তে আস্তে ত্নলারীবাঈ গুপ্ত সায়েবের এই ত্নর্বলতার সুযোগ নিতে শুরু করলো।

একদিন ভুল করে সে "তুমি" বলে ফেলেছিলো গুপ্ত সাহেবকে। বলেছিলো, "তুমি একটু চুপ করে বসে থাকো তো!"—বলেই খেয়াল হতে সে মনে মনে লজ্জা পেয়ে গেল। ছি-ছি, কী অভদ্রভাবে বললো সে, কী মনে করবে গুপ্ত সায়েব, ভদ্রলোক যে তার বাপের বয়েসী!

কিন্তু গুপ্ত সায়েবের চোখ মুখ ঝলমল করে উঠলো। বললো, "ত্নলারী, তুমি আমায় তুমি করেই বোলো। আমার শুনতে খুব ভালো লাগছে।" নিজেকে কিরকম যেন ত্নলারীর সমবয়েসী ভাবতে শুরু করলো গুপ্ত সায়েব, আর একটা আশ্চর্য তৃপ্তি পেলো তাতে।

ত্নলারী বুঝলো। বেশ ভালো করে বুঝে নিলো গুপ্ত সায়েবকে।

ব্যস, তারপর থেকে হুকুম করতে শুরু করলো।

—গুপ্ত সায়েব, আমায় এক গ্লাস জল দাও তো। জলের কুঁজোটা ওঘরে আছে। গেলাস নেই? চৌকা থেকে নিয়ে এসো।

—গুপ্ত সায়েব, বাক্স থেকে হারমোনিয়ামটা বার করে এদিকে এনে দাও তো!

—গুপ্ত সায়েব, বাঁয়া-তবলাটা একটু নিচে গাড়িতে তুলে দিয়ে এসো।

—গুপ্ত সায়েব, আমায় একটু পান এনে দেবে? ওই সামনের দোকান থেকে নয়, রাস্তার মোড়ে যে দোকানটা আছে, ওখানকার পান খুব ভালো।

—গুপ্ত সায়েব, আমার চপ্পল খুঁজে পাচ্ছি না। একটু খুঁজে দাও না। পেয়েছো? হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখানেই নিয়ে এসো।

হুকুমের ধরন একটু একটু করে বাড়তে লাগলো। মাঝে মাঝে তুলারীবাঈ নিজের স্পর্ধায় নিজেই অবাক হয়ে যেতো। এত বড়ো নামজাদা লোক গুপ্ত সায়েব, তাকে সে এরকম ভাবে হুকুম করছে, এরকম ভাবে সামান্য কাজে খাটিয়ে নিচ্ছে?

ফিরোজাবাঈ মাঝে মাঝে বলতো, "তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি করছো তুলারী। কবে একদিন খুব রাগ করে চলে যাবে, আর আসবে না।"

"একটুও রাগ করবে না, মা, ওকে এভাবে বললে ও খুব খুশী হয়। ওর সঙ্গে অন্যরকম ব্যবহার করলেই বরং ও বেশীদিন থাকবে না।"

গুপ্ত সায়েব সত্যিই এসবে একটা অন্যরকম তৃপ্তি পেতো। যার সামনে তার আই-সি-এস ছেলে মুখ তুলে কথা বলতে সাহস করতো না, তার ব্যারিস্টার ছেলের পা ঠক-ঠক করতো, যার অফিসের জুনিয়ার এটর্নিরা তার একটুখানি নেকনজরে থাকতে পারলে নিজেদের জীবন ধন্য মনে করতো, সেই জাঁদরেল লক্ষপতি এটর্নি

রমাপতি গুপ্ত এক বাঈজী-ললনার ছোটোখাটো ফাইফরমাশ খেটে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করতে লাগলো।

এমনি করে কয়েক মাস কেটে গেল।

বয়স্ক লোকের সান্নিধ্য একদিন, দু-দিন, চারদিন সওয়া যায়,—কিন্তু এক নাগাড়ে এতদিন সওয়া যায় না, বিশেষ করে মাঝে মাঝে যদি অল্পবয়েসীদের সঙ্গে দেখাশোনা হওয়ার, গল্পগুজব করার সুযোগ না হয়। এই ব্যাপারে গুপ্ত সায়েব ছিলো অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ। দুলারীর আশেপাশে অল্পবয়েসী কোনো পুরুষের অস্তিত্ব সে সহ্য করতে পারতো না। তার সারেঙ্গিয়া অল্পবয়েসী ছিলো বলে তাকে বরখাস্ত করে একজন প্রৌঢ় সারেঙ্গিয়া বহাল করেছিলো গুপ্ত সায়েব।

দুলারীবাঈ মনে মনে হাসতো। একটু অবাকও হোতো অল্পবয়েসীদের চাইতে প্রৌঢ়দের উপর গুপ্ত সায়েবের অতোখানি আস্থা দেখে। তবে ভাবতো, বেশী বয়েসের লোকের মনে কোনো অল্পবয়েসীর জন্যে মনের দুর্বলতা এলে, হয়তো এরকম ঈর্ষাপরায়ণতা, এরকম সন্দেহ হয়। বয়স্ক লোকের আত্মবিশ্বাস কমে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক।

তবু, এ ব্যাপারে দুলারীর উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করাই উচিত ছিলো গুপ্ত সায়েবের।

তবে দুলারীও কড়া হতে পারতো মাঝে মাঝে। সেও জিদী মেয়ে।

একদিন কুন্তির স্বামী ছোটুলাল এসেছিলো।

তার সঙ্গে দুলারী যখন গল্প করছে, এমন সময় গুপ্ত সায়েব এসে উপস্থিত।

ছোটুলালকে দেখে তার মুখ রাগে রাঙা হয়ে গেল। তুলারী-বাঈকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে বললো, "এ লোকটা কে ?"

তুলারী গম্ভীর হয়ে তাকিয়ে দেখলো গুপ্ত সায়েবকে। তারপর আস্তে আস্তে বললো, "ও আমার এক বন্ধুর স্বামী।"

"ও সব বন্ধুর স্বামী-ফামী চলবে না এখানে। ওকে চলে যেতে বলো।"

গুপ্ত সায়েবের কথা শুনে তুলারী চটে গেল। বললো, "দেখ গুপ্ত সায়েব, আমি বাইরে মুজরা করি না, বাড়িতেও খোলা মুজরা করা ছেড়ে দিয়েছি, সব শুধু তোমারই কথায়। কিন্তু আমার পুরোনো বন্ধু দু-চারজন যারা আছে, ওরা আসবে মাঝে মাঝে। ওদের জন্যে আমার দরজা সব সময় খোলা থাকবে। আর তখন তোমার এখানে না থাকাই ভালো। যদি তোমার ভালো না লাগে এই ব্যবস্থা, তুমি আর এসো না। তোমাকে আমার দরকার নেই।"

"কিন্তু আমি মাসে মাসে তোমায় এত টাকা দিচ্ছি—," বলে উঠলো গুপ্ত সায়েব।

তুলারীবাঈ চালাক মেয়ে। একটু হেসে বললো, "গুপ্ত সায়েব তুমি যদি মনে করো আমি শুধু টাকার জন্যে তোমাকে এত মানি, তাহলে তুমি আর আমার এখানে এসো না। শুধু টাকার সম্পর্ক হলে, আমারও অনেক চেনা শোনা আছে, তোমারও কাউকে খুঁজে পেতে অসুবিধে হবে না।"

এ-কথা শুনে গলে গেল গুপ্ত সায়েব। বললো, "না, না, আমি সেকথা বলিনি। এমনি বলছিলাম, আমার এত কাজের চাপ, তোমার কাছে এসে বসবার সময় বেশী পাই না, তাই আমি এলে যদি দেখি অন্য কেউ এসে তোমার সঙ্গে গল্প করছে, আমার কি ভালো লাগে ? যাই হোক, আমি তা হলে চললাম। কাল আসবো।"

"না, চলে যেতে হবে না। তুমি এ ঘরেই একটু বোসো। উনি এখনই চলে যাবেন।"

গুপ্ত সায়েবকে বসিয়ে ছোটুলালজীর কাছে ফিরে গেল তুলারীবাঈ।

আরেকদিন এসেছিলো সিংদেওজী। বোম্বে থেকে কলকাতায় এসেছিলো চার পাঁচ দিনের জন্যে। প্রথমদিনই সন্ধ্যেবেলা এলো তুলারীবাঈয়ের কাছে।

গুপ্ত সায়েব এসে দেখলো তুলারীবাঈয়ের ঘরে মুজরা চলছে। আর তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে আছে এক সুদর্শন যুবাপুরুষ। গুপ্ত সায়েবের বুক জ্বলে উঠলো।

তাকে দেখে গান বন্ধ করে তুলারীবাঈ বাইরে বেরিয়ে এলো। এসে বললো, "আমার একজন বন্ধু এসেছেন বোম্বে থেকে, তিন চারদিন কলকাতায় থাকবে। এই ক-দিন তুমি আর এসো না। তুমি এখন চলে যাও।"

খুব রেগে গেল গুপ্ত সায়েব। বলে উঠলো, "আমি এতদূর থেকে এলাম, আর তুমি আমায় চলে যেতে বলছো? আমায় কি তোমার মর্জি মতো চলতে হবে নাকি?"

"আমাকেও কি তোমার মর্জি মতো চলতে হবে, গুপ্ত সায়েব?"

"কেন চলবে না? আমি তোমায় মাসে মাসে টাকা দিচ্ছি না?"

তুলারী জ্বলন্ত চোখ দিয়ে তাকিয়ে দেখলো রমাপতি গুপ্তকে। তারপর বললো, "গুপ্ত সায়েব, তুমি চলে যাও। তোমাকে আর আসতে হবে না, টাকাও দিতে হবে না।"

গুপ্ত সায়েব স্থির করেছিলো আর আসবে না। কিন্তু চারদিন পাঁচদিন বাড়িতে ছটফট করে একদিন আবার ফিরে এলো

বললো, "আমাকে মাপ করো তুলারী। সেদিন রাগ করে তোমায় কটুকথা বলে ফেলেছি।"

তুলারী মনে মনে হাসলো, কিছু বললো না। সে জানতো বুড়ো বয়েসের এই নেশা কোকেনের নেশার চাইতেও সাংঘাতিক। যায় না কিছুতেই।

তুজন তুজনকে সয়ে নিলো। তুলারী জিদ করে মাঝে মাঝে বাড়িতে খোলা মুজরা করতে শুরু করলো আবার। তবে বাইরে মুজরা আর করতো না।

দৈনন্দিন জীবনের লয় আর আগের মতো অসহ্য দ্রুত নয়। এটুকুই সান্ত্বনা। এদ্দিনে মনে হোলো যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেল। এটুকুর জন্যে গুপ্ত সায়েবকে অবলম্বন না করে উপায় নেই, ওইটুকু দাম দিতে হয়।

উপায় নেই। নির্ভেজাল সুখ জীবনে পাওয়া যায় না।

আট মাস, নয় মাস, দশ মাস কেটে গেল।

একদিন গুপ্ত সায়েব আর এলো না। তার পরদিন না। তার পরদিনও নয়। খোঁজ নিলো তুলারীবাঈ। না, অসুখ-বিসুখ করেনি গুপ্ত সায়েবের। বেশ বহাল তবিয়তেই আছেন। তাহলে ?

রাজনীতিতে নেমেছেন গুপ্ত সায়েব। জীবনে সাফল্যের তুঙ্গশিখরে উঠে সাফল্যের নেশা কেটে গেছে। এখন আত্মনিয়োগ করেছেন দেশের কাজে।

শুনে তুলারীর হাসি পেলো। দেশের কাজ করবেন তো বেশ ভালো কথা, তাই বলে তুলারীর কাছে আসতে বাধা কি ? দেশের সেবা করতে গেলে কি গান শোনা চলে না ?

"না ভাই, চলে না," বললো অনন্ত পাকড়াশী। তারই কাছে খবরটা শুনেছিলো তুলারী। সে বললো, "দেশের সত্যিকারের সেবা

করতে গেলে একেবারে একনিষ্ঠ চরিত্রবান হতে হয়। গুপ্ত সায়েব কিরকম বদলে গেছেন তুমি ভাবতে পারবে না তুলারীবাঈ। ভদ্রলোক লণ্ডনের দরজির তৈরী দামী স্যুট ছাড়া পরতেন না অন্য কিছু, এখন পরেন শুধ্ মোটা খদ্দরের খাটো ধুতি আর জামা। চুরুট সিগারেট ছেড়ে দিয়েছেন, এমনকি মদও আর ছোঁন না।"

তুলারী অনেকক্ষণ গালে হাত দিয়ে ভাবলো। এসব তার অভিজ্ঞতায় একেবারে নতুন।

তুলারীবাঈয়ের কথা গুপ্ত সায়েব ভোলেন নি। অনন্ত পাকড়াশীর হাতে পাঠিয়ে দিলেন এক বছরের টাকা।

তুলারী বললো, "ওঁকে বলবেন, অন্তত একবার এসে আমায় পায়ের ধুলো দিয়ে যাবেন।"

কিন্তু গুপ্ত সায়েব আর এলেন না। তাঁর সমস্ত সময় এখন দেশের কাজে নিয়োজিত, সামান্য এক মুজরাওয়ালীর জন্যে তাঁর সময় কোথায় ?

তুলারী জীবনে খবরের কাগজ পড়েনি, এখন প্রত্যেকদিন খবরের কাগজ রাখতে শুরু করলো। কাগজে প্রায় প্রত্যেকদিনই বেরোয় গুপ্ত সায়েবের কাজের বিবরণ, তাঁর বক্তৃতা, মাঝে মাঝে তাঁর ছবি।

একদিন তুলারীবাঈ খদ্দরের শাড়ি পরে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে গুপ্ত সায়েবের বক্তৃতা শুনতে গেল। মঞ্চের উপর অন্যান্য সহকর্মীদের মাঝখানে শুভ্র খদ্দর-সজ্জায় নতুন মানুষ গুপ্ত সায়েবকে দেখে অবাক হয়ে গেল তুলারীবাঈ। অনন্যসাধারণ তেজোদৃপ্ত চেহারা, মুখচোখ ভরে একটা আশ্চর্য সৌম্য প্রশান্তি। এক নতুন ব্যক্তিত্বে মহীয়ান হয়ে উঠেছে দেশবরেণ্য জননেতা রমাপতি গুপ্ত। আগের সেই গুপ্ত সায়েব এ নয়। জ্বালাময়ী তার ভাষণ। অন্যান্য শ্রোতাদের সঙ্গে সঙ্গে তুলারীর রক্তেও যেন আগুন ধরে গেল।

একটা আশ্চর্য গর্বে ভরে উঠলো তুলারীর মন। এ কি সেই গুপ্ত সায়েব, যাকে সে রাতের পর রাত গান শুনিয়েছে, যে তাকে

কতোবার হাত ধরে বলেছে,—আমার জীবনের একটা দিক একেবারে ফাঁকা হয়ে আছে তুলারী, তুমি সেটি ভরিয়ে তোলো।

তুলারী তাকিয়ে দেখলো চারদিকের অগণিত মন্ত্রমুগ্ধ জনসমুদ্র। ভাবলো, এরা কি জানে, এদের এই যে নেতা যার মুখের তুটো কথা শুনবার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকে দেশের সমস্ত লোক, যার দাবানল-ব্যক্তিত্বের প্রভাবে আজ ইংরেজ সরকারের চোখে ঘুম নেই,—সে লোকটির জীবনে একদিন এসেছিলো এক তুলারীবাঈ, যে আজ হারিয়ে গেছে এই জনতার মহাসমুদ্রে।

ভাবলো,—ও আমার জননেতা, একবার যদি এসে এই সামান্য মেয়েটিকে বলে যাও, তুলারী, আমায় প্রেরণা দিয়েছে তোমার গান, তাহলে তোমার তুলারীবাঈ তার সর্বস্ব ত্যাগ করে তোমারই পেছনে এসে দাঁড়াবে, নেমে যাবে দেশের কাজে। আমি তোমায় মিছে কথা বলতে বলছি না, সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা আমি তোমায় গান শুনিয়েছি তুমি আমায় টাকা দিয়েছো বলে, আমি তোমায় ভালোবাসিনি কোনোদিন, সে হয় না, সবে মাত্র তোমায় শ্রদ্ধা করতে শুরু করেছি আর দশজনার মতো। কিন্তু তুমি আমায় ভালোবেসেছিলে, সে কথা তো সত্যি। আমি তোমায় গান শুনিয়েছিলাম, সে কথাও সত্যি। এটুকু আমার কাছে এসে চুপি চুপি স্বীকার করে যাও .....।

তারপর হঠাৎ সামলে নিলো নিজের মনকে। হাসলো মনে মনে। কী আবোল তাবোল ভাবছে সে। এসব কথা তার জননেতা এসে বলতে যাবে কেন? প্রেরণা তো তুলারী দেয়নি, এ প্রেরণা মুজরাওয়ালী দিতে পারে না, এ প্রেরণা আসে মনের ভিতর থেকে। সে যেটুকু দিয়েছে গুপ্ত সায়েবকে, তিনি মাসে মাসে তার দাম ধরে দিয়েছেন, অনেক বেশিই দিয়েছেন, এক বছরের মাসোহারা অতিরিক্ত দিয়েছেন।

হায় রে! তখন যদি বুঝতে পারতাম ইনি এতবড় একজন মহাপুরুষ! কী আর হোতো,—তুলারীবাঈ ভাবলো,—আমি ভয়

পেতাম, রাজী হতে পারতাম না, আমার এই গত এক বছরের রোজগারটা হোতো না।

তুলারী মনে মনে হাসলো। ভাবলো,—ওঁর বক্তৃতা শুনে আশপাশের লোকেরা কি ভাবছে আর আমি কি ভাবছি।

বক্তৃতার শেষে জননেতা রমাপতি গুপ্ত জনতার কাছে দেশের জন্যে ভিক্ষার ঝুলি তুলে ধরলেন। যার যা আছে, অকাতরে দিয়ে দিতে লাগলো সবাই। মেয়েরা গা থেকে গয়না খুলে দিতে লাগলো। অন্যান্য মহিলা-শ্রোতাদের সঙ্গে তুলারীও এগিয়ে এলো। নেতার সামনে এসে সে হাত থেকে গলা থেকে খুলে দিলো সমস্ত গয়না,—চুড়ি, বালা, নেকলেস, আঙটি, দুল। তারপর অন্যান্য সবার মতো সামনে ঝুঁকে পড়ে নেতার পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ছোঁয়ালো।

প্রণাম করে সোজাসুজি উঠে দাঁড়াতেই চোখাচোখি হোলো জননেতার সঙ্গে। এক নিমেষের জন্যে চিনতে পারার আধো ভীরু আধো উৎসুক দৃষ্টি ফুটে উঠলো সেই চোখে, এক পলকের মধ্যে আবার সে-চাউনি স্নিগ্ধ হয়ে গেল, শান্ত হয়ে গেল। অন্যান্য মেয়েদের মতো তুলারীকেও আশীর্বাদ করলেন জনসম্রাট রমাপতি গুপ্ত। বললেন, "মা! তোমার কল্যাণ হোক।"

মা !!!—তুলারীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত বিদ্যুতের প্রবাহ বয়ে গেল।

মা !!!—রাগে জ্বলে উঠলো তুলারীর সমস্ত শরীর। মা বলে তাকে এই অপমান করা কেন? কি অপরাধ করেছে সে? সে তো গুপ্ত সায়েবের কাছে কিছু চায়নি। সে ফিরে চায়নি তাকে, চিনতে চায়নি, কিছু চায়নি। কেন শুধু এমনি চুপ করে রইলো না গুপ্ত সায়েব। কেন এরকম নিষ্ঠুর হয়ে চাবুক মারলো তার মনের উপর?

সেদিন তুলারী সারারাত বিছানায় ছটফট করলো। কিছুতেই তার চোখে ঘুম এলো না।

কয়েকদিন পরে একদিন অনন্ত পাকড়াশী এলো। ইতিমধ্যে তার সঙ্গে গুপ্ত সায়েবের বনিবনাও কমে গিয়েছিলো, কারণ সে ছিলো একটি বিরুদ্ধ রাজনৈতিক দলের লোক। গুপ্ত সায়েবের সম্বন্ধে যে একটা ক্ষোভ আছে তুলারীর মনে সে কথা সে জানতো। বললো, "একজন ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান। উনি তোমার মুখ থেকে একথা শুনতে চান যে এক সময় তোমার এখানে গুপ্ত সায়েবের যাতায়াত ছিলো।"

"একথা শুনে কি লাভ," তুলারী ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো।

পাকড়াশী একটু ইতস্তত করলো। তারপর বললো, "দেখ, কথাটা তোমায় খুলেই বলি। গুপ্ত সায়েব তো বেশ নেতা সেজে বসে আছেন। খুব ভালো কথা। কিন্তু তা নিয়ে বেশী বাড়াবাড়ি করা তো ঠিক নয়। উনি তাই করছেন। সে অনেক কথা। ও সব রাজনীতির ব্যাপার। তুমি বুঝবে না। এখন ওকে একটু দাবিয়ে দেওয়ার দরকার হয়ে পড়েছে। কিন্তু ওর উপর সবার একটা অন্ধ বিশ্বাস আছে। সুতরাং ওর ভক্তেরা যদি একথা জানতে পারে যে উনি যতো চরিত্রবান বলে লোকে মনে করে, ঠিক ততোটা নন, তাহলে তাঁকে নিয়ে কেউ আর এতটা বাড়াবাড়ি করবে না।"

তুলারীবাঈ কোনো উত্তর দিলো না, চুপ করে রইলো।

"তুমি অতো ভাবছো কেন," বললো অনন্ত পাকড়াশী, "তোমায় তো কোনো রকম মিছে কথা বলতে বলা হচ্ছে না। তুমি শুধু সত্যি কথাটাই বলবে। আমি বরং এর জন্যে তোমায় একটা মোটা টাকা পাইয়ে দেবো।"

তুলারী একথা শুনে ফশ করে জ্বলে উঠলো দেশলাইয়ের কাঠির মতো। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে শুধু বললো, "আপনি বেরিয়ে যান এখান থেকে। আর কোনোদিন আসবেন না।

বিকেল হয়ে আসছে। রোদ সরে গেছে পশ্চিমের জানলা থেকে।

বৃন্দা এসে জিজ্ঞেস করলো, "চা করে দেবো?"

তুলারীবাঈ কোনো উত্তর দিলো না। বৃন্দা ভাবলো বোধ হয় ঘুম ভাঙেনি এখনো। আর কিছু না বলে সরে গেল সেখান থেকে।

বৌবাজার স্ট্রীটে তখন খুব শোরগোল। কয়েকদিন ধরে একটা আন্দোলন চলছে শহরে। বিকেল হতে ময়দান-মুখো মিছিলের সংখ্যা বাড়তে লাগলো। কখন এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গেল।

তু-এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিলো সেদিনও—তুলারীর মনে পড়লো, এমনি এক বিকেলবেলা। রাস্তায় শোরগোল আজ থেকে অনেক অনেক বেশি। কলেজ স্ট্রীট বৌবাজার লোকে লোকারণ্য। দেশের এতবড় একজন নেতা মারা গেছেন, তাঁর শবযাত্রা। দেশের লোকে তাঁকে আরেকটি নামে জানে, আদর করে সেই নাম দিয়েছে তাঁকে। শুধ্ তুলারীর কাছেই তিনি গুপ্ত সায়েব।

দেশের রাজনৈতিক অবস্থা খুব গুরুতর। ইওরোপে জার্মানরা একটার পর একটা দেশ দখল করে চলেছে। সুদূর প্রাচ্যেও যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। জাপানীরা দখল করেছে ইন্দোচীন, শ্যাম, মালয়, বর্মা। তখন উনিশশো বেয়াল্লিশের জুন মাস। চারদিকে একটা অনিশ্চিত অবস্থা। শোনা যাচ্ছে, দেশে একটা নতুন রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হবে।

ঠিক এ সময়ে এতবড় একজন নেতাকে হারানো দেশের পক্ষে মস্ত তুর্ভাগ্য।—সবাই তাই বলাবলি করছিলো।

সেদিন জানলায় দাঁড়িয়ে পথের জনতা দেখছিলো তুলারীবাঈ। সকালে খবরটা পাওয়ার পর থেকে মনটা আকাশের মতই থমথমে হয়ে ছিলো। সারাদিন এলোমেলো মনে পড়ছিলো গুপ্ত সায়েবের কথা, নানা সন্ধ্যার টুকরো-টুকরো অসংখ্য ছোটোখাটো কথা।

অপরাহ্ন মিলিয়ে গেল ঝাপসা সন্ধ্যায়, সন্ধ্যা গাঢ় অন্ধকার হয়ে মিলিয়ে গেল নিথর রাত্রিতে। কখন শবযাত্রা রাজপথ বেয়ে

চলে গেল, মনে নেই। যে-পথে লাখ লাখ লোক ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে ছিলো সারাদিন, সারা বিকেল, সে-পথ কখন নির্জন হয়ে গেল অনেক রাত্তিরে।

একজন চলে গেল—কিন্তু কোথাও যেন কোনো পরিবর্তন হোলো না। অনেক দূরের ফ্ল্যাটবাড়িগুলোর জানলায় জানলায় টুপটুপ নিভে গেল ইলেকট্রিক আলো, নিস্তব্ধ অন্ধকার যেন মুখর হয়ে উঠলো অসংখ্য গৃহস্থ-বধূর অশ্রুত নিশীথগুঞ্জনে। অসংযত হাসির টুকরো ভেসে এলো আশে-পাশের বাড়ির নগরবধূদের রুদ্ধদ্বার কক্ষ থেকে। পথ দিয়ে হেঁকে গেল বেলফুলের মালা।

গুপ্ত সায়েবের জন্যে যে এমন কিছু মমতা ছিলো তা নয়,—কিন্তু তারপর থেকেই কেমন যেন একটা ব্যাপক নিস্পৃহতা এলো দুলারীবাঈয়ের মনে। নিজের হৃদয়কে যেন একটা মস্ত বড় ফাঁকা বাড়ির মতো মনে হয়, যেখানে একদা অনেক আলো জ্বলতো, অনেক লোকজন থাকতো, অনেক আনন্দ-উৎসবে পরিপূর্ণ থাকতো দ্রুত-সঞ্চার দিনগুলি। এখন শুধু ফাঁকা থমথমে নির্জন হলঘর, অন্ধকার জানলা, মাঝে মাঝে একটি-দুটি আলো মিটমিট করে একটা-দুটো জানলায়। দমকা হাওয়ায় স্মৃতির ওপার থেকে ভেসে আসে অতীত জলসার একটা-দুটো গানের রেশ।

দিনগুলো আরো মন্থর হয়ে এলো। সারাদিনের নিষ্প্রাণ রুটিন-বাঁধা দিনের পর দিন। সকালবেলা রেওয়াজ, দুপুরে ঘুম, রাত্রে মুজরা—তাও সব দিন নয়। এককালে এর মধ্যে একটা নেশা লাগতো। এখন শুধু একটা ছকে বাঁধা দৈনন্দিন জীবনের জের টেনে চলা।

কেটে গেল উনিশশো বেয়াল্লিশ, তেতাল্লিশ, চুয়াল্লিশ। রোজগার কমতে লাগলো আস্তে আস্তে। মুজরার শখ যেন

কমে গেল লোকের মধ্যে, কমে গেল বাঈজীর চাহিদা। যুদ্ধকালীন আবহাওয়ায় যে শ্রেণীর মেয়ের চাহিদা বেড়ে গেল তাদের কোনো খানদানী নেই। তাদের মধ্যে গোত্রান্তরিত হতে পারলো না ছুলারীবাঈ, সে নিজেকে নিজের মধ্যে আরো গুটিয়ে নিলো।

উনিশশো পঁয়তাল্লিশ, ছেচল্লিশ, সাতচল্লিশ পার হয়ে পৃথিবীর ইতিহাস নতুন পথ ধরলো। আস্তে আস্তে কমতে লাগলো বৌবাজারের মুজরাওয়ালীর সংখ্যা। অনেকে ফিরে গেল বেনারস-লক্ষ্ণৌএ, কেউ বা চলে গেল লাহোরে-ঢাকায়।

রোজগার আরো কমতে লাগলো। মাসে ছুটো-তিনটের বেশী মুজরো হয় না। যে শ্রেণী ছিলো খানদানী বাঈজীদের পৃষ্ঠপোষক, তাদের হাতের পয়সা শেষ হয়ে গেছে, যে নতুন শ্রেণীর হাতে পয়সা এসেছে, তাদের সামাজিক আর অসামাজিক রুচি একেবারে অন্যরকম।

ফিরোজাবাঈ বুড়ি হয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘকাল অসুখে ভুগে ভুগে একেবারে শয্যাশায়ী। সে চেয়েছিলো এই পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিক ছুলারীবাঈ। কিন্তু ছুলারীর মন তাতে সায় দেয়নি।

মায়ের পীড়াপীড়িতে রাজী হয়ে একতলায় এক এক কামরার ছোটো ছোটো ঘর করে ভাড়া দিয়ে দিয়েছিলো। ভাড়া আদায় করা ছাড়া তাদের সঙ্গে আর কোনো যোগাযোগই রাখতো না সে। তেতলা থেকে নিচে নামতোই না সন্ধ্যার পর।

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলো তার বোন রোশনী। কনভেণ্টে পড়তো। হোস্টেলে থাকতো। মা-বোনের সঙ্গে বিশেষ কোনো যোগাযোগ ছিলো না। বড় হয়ে গিয়েছিলো ইতিমধ্যে। ফ্রক পরতো, সালোয়ার-কামিজ পরতো, ইংরেজিই বলত বেশির ভাগ সময়। উর্দু বলতো কখনো-সখনো। বাংলাটা একেবারে শেখেই নি।

একদিন কানে এলো যে রোশনীকে নানারকম লোকের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে চৌরঙ্গী পার্ক স্ট্রীট অঞ্চলের বিভিন্ন অভিজাত হোটেল-রেস্তর াঁয়। তুলারী বোনকে মানা করতে গেল একদিন। ওর কথা শুনে রোশনী খুব হাসলো। হাসতে হাসতে বললো, "তুমি? তুমি আমায় বলতে আসছো আমি কার সঙ্গে বাইরে বেরোবো কার সঙ্গে বেরোবো না?"

সেই হাসির মধ্যে একটা ধারালো ব্যঙ্গ ছিলো। তুলারীর সারা মুখ লাল হয়ে গেল। কোনো কথা না বলে সে বাড়ি ফিরে এলো।

রোশনীর সঙ্গে তারপর আর দেখা হয়নি কোনোদিন।

সে একদিন বম্বে চলে গেল। চিঠি লিখে জানালো যে সে সিনেমায় নামবে। বোধহয় তু-তিনটে বইতে ছোটোখাটো রোল্-এ নেমেও ছিলো।

তারপর অনেকদিন কোনো খবর নেই।

একদিন তুলারী ফিরোজাবাঈয়ের কাছে শুনলো যে রোশনী এক ধনী মিল-মালিকের সঙ্গেই আছে। না, ঠিক বিয়ে করে নয়, তবে প্রায় বিয়ের মতোই।

রোশনীর যা কিছু চিঠিপত্র লেখা, সে শুধু মায়ের কাছেই। মাঝে মাঝে টাকাকড়িও পাঠাতো। তাই তাকে নিয়ে ফিরোজাবাঈয়ের খুব গর্ব।

ফিরোজা একদিন জানালো, রোশনী তাকে বম্বে চলে যেতে লিখেছে।

তুলারী সহজভাবেই বললো, "বেশ তো, যাও না, ওখানে ভালোই থাকবে।"

ফিরোজা আস্তে আস্তে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো। তারপর উত্তর দিলো, "রোশনী পর হয়ে গেছে। ও একলা থাকতে পারবে। তুমি পারবে না।"

অনেকদিন পর মাকে সেদিন তুলারীর খুব ভালো লাগলো।

আট

সন্ধ্যে হয়ে এলো।

একতলা দোতলার সমস্ত কলঘরে জলের ঝুপ ঝুপ শব্দ। সবাই স্নান করে নিচ্ছে এক-একজন করে। বারান্দায়-বারান্দায় চিকের আড়ালে সাজগোজ করে এসে দাঁড়িয়েছে দু-চার-পাঁচ জন।

বৃন্দা এসে ঘরের আলো জ্বালিয়ে দিলো। কপালে হাত দিয়ে বললো, "ও মা, গা যে একেবারে আগুনে পুড়ে যাচ্ছে গো। ডাক্তার ডাকি?"

"না, ডাক্তার দরকার নেই," ধরা গলায় উত্তর দিলো দুলারী, "কাল সকালেই ঠিক হয়ে যাবো।"

বৃন্দা একটু পরে ফিরে এলো। বললো, "সিংদেওজী এসেছেন।"

দুলারী জানতো যে সিংদেওজী আসবে। বললো, "এখানে নিয়ে আয়।"

সিংদেওজীর সঙ্গে মাঝখানে চার পাঁচ বছর দেখা হয়নি, বম্বেতে ব্যবসা করতো সে। স্টেট থেকে যে মাসোহারা পেতো এক সময়, পারিবারিক গোলমালে সেটা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাকে বম্বে যেতে হয়েছিলো। প্রথম তিন চার বছর সে কলকাতায় আসতো বছরে একবার দুবার। তারপরে কয়েক বছর আর দেখা নেই।

তারপর এই উনিশশো পঞ্চাশের একদিন এক সন্ধ্যায় হঠাৎ সে সিঁড়ি বেয়ে তেতলায় উঠে এলো।

তাকে দেখে দুলারীবাঈ খুশী হোলো। পুরোনো চেনাশোনা যারা ছিলো অনেকেই নিখোঁজ হয়ে গেছে। আজকাল মাঝে মাঝে যারা আসে, স্রোতের তৃণের মতোই আসে। এসে দরদস্তুর করে,

গান শোনে, টাকা ফেলে দিয়ে আবার ভেসে চলে যায়। অবসর উপভোগ করতে কেউ আসে না, আসে পারিবারিক জীবনের তিক্ততার পরিবেশ থেকে কিছুক্ষণের মতো পালিয়ে থাকবার জন্যে। নিজের আনন্দ ফুর্তির জন্যে কেউ আসে না বড়ো একটা, আসে ব্যবসা বা কাজের উপলক্ষে কাউকে আপ্যায়িত করবার জন্যে তাকে সঙ্গে নিয়ে। গান কেউ শোনে না, গানের মাঝখানে নিজেদের কাজের কথাবার্তা বলে, একলা থাকলে আনমনা হয়ে থাকে, যাবার সময় গুনে গুনে নোট দেয়, খরচা করলাম কতো, পেলাম কতোখানি, মনে মনে সেই হিসেব করে। কাউকে দু'বার দেখা যায় না। কারো সঙ্গে অন্তরঙ্গতাও জমে ওঠে না।

তাই অনেকদিন পরে পুরোনো পরিচিত একজনকে পেয়ে দুলারীবাঈ খুশী হোলো খুব। দেরাজ থেকে স্কচ হুইস্কির বোতল বার করে আনলো, বৃন্দাকে বললো সেণ্ট্র্যাল এভিনিউর পানের দোকান থেকে ভালো মঘাই পান আনিয়ে দেওয়ার জন্যে।

সিংদেওজী চারদিক তাকিয়ে দেখলো। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আগের মতোই, তবে সেই স্বচ্ছলতার ছাপ নেই। ঘরের মাঝখানের শ্যাণ্ডেলিয়েরটা নেই, দামী কাচের শেড লাগানো একটি মাত্র ইলেকট্রিক বাল্‌ব্‌ ঝুলছে সেখানে। জানলার পর্দাগুলো সস্তা হ্যাণ্ডলুমের, দরজায় ঝোলানো কাঁচের পুঁতির পর্দাটা নেই। তাকিয়াগুলোর সাটিন আর নেই, তার বদলে আছে দিশী ছিট। ঘরের মাঝখানের গালচে বিবর্ণ হয়ে গেছে, ছিঁড়ে গেছে জায়গায় জায়গায়।

"সব কিছু বদলে গেছে দেখছি," সিংদেওজী বললো।

"আমি বদলাইনি ?" হেসে জিজ্ঞেস করলো দুলারীবাঈ।

"তুমি ?" সিংদেওজী তাকালো দুলারীর দিকে, "তুমিও একটু গম্ভীর হয়ে গেছ।"

"মোটা হয়ে যাইনি ?"

"তা হয়েছো। তবে তুমি নিজের থেকে না বললে তো সে কথা বলা যায় না। মোটা হয়ে গেছ কেন? আজকাল আর নাচো না?"

"নাচ তো ছেড়ে দিয়েছি অনেকদিন," তুলারী উত্তর দিলো।

"গান নিশ্চয়ই ছাড়োনি—।"

"না, গান ছাড়িনি। তবে আজকাল ভালো গান শুনতে চায় না কেউ। সিনেমার গান গাইতে বলে," বললো তুলারী।

"সিনেমার গান গাও?"

"একটা তুটো না গেয়ে উপায় কি?"

"যাক, আমি তো কোনোদিন তোমায় সিনেমার গান গাইতে বলবো না," বললো সিংদেওজী, "আজ তুমি আমায় একটি ভালো গান শোনাও।"

তুলারী হাসলো। বললো, "বেশ। শুনতে যখন চাইছো, নিশ্চয়ই শোনাবো। দাঁড়াও, হারমোনিয়ামটা বার করে দিতে বলি—।"

"তোমার সারেঙ্গিয়া, তবলচি, ওরা কোথায়?" জিজ্ঞেস করলো সিংদেওজী।

তুলারী হাসলো। কিন্তু ম্লান হয়ে গেল ওর চোখ তুটো, বললো, "ওদের সঙ্গে রোজানা ব্যবস্থা আর নেই। আজকাল তো আর দরকার হয় না। যদি আগের থেকে বায়না দেওয়া থাকে, কাউকে আনিয়ে নিই।"

কি ভেবে সিংদেওজী বললো, "তুলারীবাঈ, আজ থাক। আজ গান শুনবো না। আমি পরশু আসবো। পরশু তোমার মুজরা। আগের দিনে যে রকম খুব জমকালো করে, খুব হৈ-চৈ করে হোতো, ঠিক তেমনি। তুমি সারেঙ্গিয়া আর তবলচিকে খবর দিয়ে আনিয়ে নিও। আর তোমার তুহার সেই মেয়েটি,—কি নাম তার?—হ্যাঁ, আয়েশা, সে কোথায়?"

"আয়েশা? জানি না। শুনেছিলাম সেণ্ট্র্যাল অ্যাভিনিউতে ফ্ল্যাট নিয়ে আছে। আমার সঙ্গে অনেক বছর দেখা নেই।"

"আর কাউকে পাওয়া যাবে না? না থাক, দরকার নেই। আমায় ওর ঠিকানা দাও, ওকে আমিই ধরে নিয়ে আসবো।"

"তুমি একাই আসবে?" তুলারী জিজ্ঞেস করলো।

একটু ভাবলো সিংদেওজী। তারপর বললো, "হ্যাঁ, আমি একা। আর কাউকে ডাকবো না। তুলারীবাঈ, একটা কথা তোমায় বলবো?—এটা তোমার শেষ মুজরা।"

"মানে?" তুলারী ভুরু তুলে জিজ্ঞেস করলো।

"আছে, আছে, অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে," বললো সিংদেওজী। "আজ তোমার সঙ্গে এমনি বসে গল্প করবো, তারপর অনেক কথা বলবো তোমায়।"

অনেকক্ষণ তুলারীর সঙ্গে বসে গল্প করলো সিংদেওজী। তারপর বললো, "জানো তুলারী, এই পাঁচ বছর তোমার কথা আমি ভুলতে পারিনি। প্রত্যেক দিন তোমায় মনে করতাম।"

তুলারী ঠাট্টা করে একটা সৌজন্যতা করতে গেল। কিন্তু পারলো না, তার চোখ তুটো জলে ভরে গেল।

সিংদেওজী বললো, "আমি কলকাতায় নতুন অফিস খুলেছি। এখন থেকে আমি বেশির ভাগ সময় এখানেই থাকবো। বম্বের অফিস দেখবে আমার পার্টনার। এখন প্রত্যেকদিনই দেখা হবে তোমার সঙ্গে।"

"তোমার স্ত্রীও কলকাতায় এসেছেন?" তুলারী জিজ্ঞেস করলো।

"আমার স্ত্রী?" সিংদেওজী হাসলো, "আমার স্ত্রী ছেলেমেয়েদের নিয়ে বিলেত চলে গেছে ওর ভায়ের সঙ্গে। সে আর এদেশে ফিরবে না। আমার সঙ্গে ওর কোনো যোগাযোগ নেই।"

তুলারী আর কিছু জিজ্ঞেস করলো না। সিংদেওজীও চুপ করে রইলো অনেকক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে ডাকলো,

।”

“কি ?”

“এক কাজ করলে হয় না ?”

“কি কাজ ?”

“দেখ, এই নোংরা বাড়িতে তুমি আর কদ্দিন থাকবে,” বললো সিংদেওজী, “অনেক হয়েছে, আর নয়। ভাবছি শহরের বাইরে আমি একটা ছোটো বাড়ি কিনে নেবো। তাহলে তোমাতে আমাতে মিলে ওখানে বেশ থাকা যাবে। কি বলো ?”

তুলারী কিছুক্ষণ কোনো উত্তর দিলো না। তারপর বললো, “সিংদেওজী, তুমি যদি আমায় এই আবহাওয়ার মধ্যে থেকে বার করে নিয়ে যেতে পারো, তাহলে আমার গাছতলায় গিয়ে থাকতেও আপত্তি নেই।”

আরো কিছুক্ষণ গল্প করে সিংদেওজী উঠে পড়লো। বললো, “তাহলে ওই কথা রইলো। পরশু—।”

পরদিন খুব উৎসাহের সঙ্গে তুলারী বাইরের ঘরটা ঝাড়পোঁছ করালো। চাকর পাঠিয়ে একদিনের জন্যে এক বাবুর্চি ঠিক করলো। সে বিরিয়ানী তৈরী করবে, মাংস তৈরী করবে, কাবাব তৈরী করবে। তবলচি রাজকিশোরজীকে খবর পাঠালো, সারেঙ্গিয়া দিলদার খানকে খবর পাঠালো, হারমোনিয়াম বাজাবার জন্যে খবর পাঠালো অমৃতলাল পারেখকে। আলমারি থেকে কাচের ডিক্যাণ্টার বার করে নিজে সাবানজল দিয়ে পরিষ্কার করলো সে-সব। ডেকরেটারের কাছ থেকে একটি ঝাড় ভাড়া করে এনে টাঙিয়ে দিলো ঘরের মাঝখানে।

কিন্তু আজ সকাল থেকেই অসহ্য মাথা ধরেছে, গায়েও জ্বর। সারাদিন শুয়ে থাকতে হয়েছে বিছানায়। কখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে খেয়াল নেই।

খেয়াল হোলো যখন বৃন্দা এসে৷ বললো, "সিংদেওজী এসেছেন।"

সিংদেওজী আসবে, সারাদিন ধরে তুলারী ছিলো সেই প্রতীক্ষায়। বললো, "এখানে নিয়ে আয়।" তারপর বললো, "না, এখানে নয়, বাইরের মাইফিল ঘরে নিয়ে বসিয়ে দে। আমি আসছি। আর কে কে এসেছে?"

"রাজকিশোরজী এসেছে," বৃন্দা উত্তর দিলো, "দিলদার সাহেব এসেছে, আর এসেছে অমৃতলালজী। খুব সাজগোজ করে কে একজন মেয়েছেলে এসেছে সিংদেওজীর সঙ্গে।"

"ও হ্যাঁ, সে আয়েশাবাঈ। তুই বাবুর্চিখানায় গিয়ে দেখ সব ঠিকমতো হচ্ছে কিনা।"

ঘরের চারদিক পর্যবেক্ষণ করে খুব উৎফুল্ল হোলো সিংদেওজী। জানলায় দরজায় নতুন রেশমী পর্দা। ঝাড়ের আলোয় ঘরের চেহারা বদলে গেছে। ধপধপ করছে গদী আর তাকিয়া।

আয়েশাবাঈ বসেছিলো একপাশে। এদিকে দিলদার সাহেব সারেঙ্গির কান মুচড়ে মুচড়ে সুর বাঁধছিলো। হাতুড়ি দিয়ে তবলা ঠিক করছিলো রাজকিশোরজী। বৃন্দা একটি ট্রে-তে করে হুইস্কি আর সোডা দিয়ে গেল।

ঘর ভরে তখন রজনীগন্ধা আর বেলফুলের গন্ধ,—আগের দিনের মতো।

খানিকক্ষণ পরে তুলারীবাঈ ঘরে ঢুকলো। তাকে দেখে সবাই বিমুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলো তার দিকে। জমকালো বেনারসী

শাড়িতে আশ্চর্য সেজেছে সে, তাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে গা-ভর্তি পুরোনো ফ্যাশনের জড়োয়া গহনায়।

সে এসে বসলো আয়েশার পাশে। ডান পা মুড়ে বসে, বাম পা হাঁটুর কাছে মুড়ে উঁচু করে তাতে বাঁ হাত রেখে, এক হাত কানের উপর ধরে অন্য হাতে ভাও দিয়ে গাইতে শুরু করলো পুরোনো দিনের একটি গান ঃ

ন ম্যয় শওক হুঁ
ন ম্যয় গুলফিজাঁ
ন কিসী কা আশীকজার হুঁ
ম্যয় উস বিরাঁ কী হুঁ ফিজাঁ
কিসী খোয়ে হুয়ে দিল কী পুকার হুঁ।

সারেঙ্গি তার তবলার সঙ্গত জমে উঠলো খুব। তার সঙ্গে সঙ্গে তৈরী গলায় তান ছাড়লো আয়শাবাঈ। হুইস্কির গেলাস নামিয়ে হর্ষভরে তারিফ করলো সিংদেওজী।

গান শেষ হতে বললো, "ঠিক পুরোনো দিনের মতো মনে হচ্ছে, না?"

দুলারী উত্তর দেওয়ার আগেই, দরজার ওধার থেকে কে যেন তার নাম ধরে ডাকলো।

"কে?"

যে ঘরের মধ্যে ঢুকলো তাকে দেখে দুলারী অবাক।

"কমলবাবু? তুমি? এদ্দিন পরে হঠাৎ কোত্থেকে?" কোনো রকমে জিজ্ঞেস করলো দুলারী।

"চিনতে পারলে তাহলে? আমি ভেবেছিলাম চিনতে পারবে না।"

দুলারীর গলা ধরে গেল হঠাৎ। বললো, "তুমি যদি এদ্দিন পরে আমায় মনে করতে পারলে, আমিই বা এদ্দিন পরে তোমায় চিনতে পারবো না কেন?"

"তুমি অনেক বড় হয়ে গেছো ডুলারী," কমল বললো।

ডুলারী হেসে ফেললো। সিংদেওজীকে বললো, "আমার যখন দশ-এগারো বছর বয়েস, সেই সময় থেকে ওঁর সঙ্গে আমার চেনা। এসো। বোসো। ইনি সিংদেওজী, আমার খুব বন্ধু।"

সিংদেওজীর মন তখন রঙীন হয়ে আছে হুইস্কির নেশায়। বললো, "আমি ডুলারীর বন্ধু, ডুলারী তোমার বন্ধু, সুতরাং তুমি আমার বন্ধু। তুমি ডুলারীর বন্ধু, ডুলারী আমার বন্ধু, তাহলে আমি তোমার বন্ধু। এসো ভাই, তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে পড়ো।"

"এদ্দিন ছিলে কোথায়?" ডুলারী জিজ্ঞেস করলো।

"সাউথ আফ্রিকায়। চাকরি নিয়ে চলে গিয়েছিলাম," কমল উত্তর দিলো। "কয়েকদিন হোলো ফিরেছি।"

"থাকো কোথায়?"

"কোথায় আর থাকবো? তুমি তো জানো আমার চালচুলো নেই। মা-বাবাও মারা গেছেন অনেকদিন। এখন সেণ্ট্র্যাল অ্যাভিনিউতে একটি হোটেলে উঠেছি।"

"ম্," একটু ভাবলো সিংদেওজী। তারপর বললো, "চালচুলো তোমারও নেই। যাক, আমাদের সবারই দেখছি একই তকদীর। দেখ, ডুলারীবাঈ এ বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে। আমরা একটা ছোটো বাড়ি নিচ্ছি শহরের একটু বাইরে। নেহাত রাজবাড়ি বা নিজামের প্যালেস না হলে যদি তোমার চলে, তুমি তোমার ওই হোটেল থেকে উঠে সোজা আমাদের কাছে চলে এসো। কি বলো ডুলারী? আমাদের দু'জনের রুটি যদি জোটে, তিনজনের জুটবে না?"

ডুলারীর চোখ দুটো খুশিতে ছলছল করে উঠলো।

সিংদেওজী বললো, "ঠিক পুরোনো দিনের মতো, না?"

"হ্যাঁ, ঠিক পুরোনো দিনের মতো," উত্তর দিলো ডুলারীবাঈ,

"আজ আমার আরেকজনের কথা খুব মনে পড়ছে। সে থাকলে খুব খুশী হোতো আজ।"

"কে, তুলারীবাঈ?"

"লছমীপ্রসাদজী, যিনি আমায় গান শিখিয়েছেন।"

কমল জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা, আজ বাইরে এত প্রসেশান কিসের? ট্রাম-বাস সব বন্ধ। আমায় এসপ্লানেড থেকে হেঁটে আসতে হয়েছে।"

"প্রসেশানের উপলক্ষের অভাব কি?" সিংদেওজী বললো, "চাল নেই, কাপড়ের দাম আগুনের মতো, চাকরি নেই, ছাঁটাই হচ্ছে—কতো সমস্যা। কিন্তু আজকের মতো ওসব ভাবনা নয়,—আজ তুলারীর শেষ মুজরা। পরশু আমরা চলে যাচ্ছি নতুন বাড়িতে। ভাই তুলারীবাঈ, আরেকটা—।"

বৃন্দা এসে হুইস্কির ট্রে রেখে গেল।

তুলারী একটার পর একটা গাইলো তার পুরোনো দিনের গান-গুলো। নাচ ধরলো আয়েশাবাঈ। রাজকিশোরজী তবলার সঙ্গে তার পদক্ষেপের দ্বন্দ্ব সবার হৃদয়ের স্পন্দনের লয় বাড়িয়ে দিলো। প্রচুর হাসি, প্রচুর অশান্ত গান, হৈ-চৈ-গল্পে কেটে গেল অনেকখানি সময়।

বাইরের পথ থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসছে স্লোগানের ধ্বনি, গণমিছিলের দৃপ্ত পদক্ষেপ। কে যেন বললে ধরমতলায় পুলিশের লাঠি চার্জ হয়েছে।

ঘরের ভিতর জমে উঠেছে তুলারীবাঈয়ের মুজরা। গান গাইতে গাইতে একটু আনমনা হয়ে গেল সে। তারপর বললো, "আজ

লছমীপ্রসাদজীর কথা আমার খুব মনে পড়েছে। সে আমায় একটি গান প্রায়ই শোনাতো। আজ সে গানটিও গাই, কেমন?"—বলে গান ধরলো—গোরী, তেরে নয়না কাজর বিন কারে…

তারপর দু-লাইন গেয়েই সামনে ঢলে পড়লো।

থেমে গেল তবলা, থেমে গেল সারেঙ্গি হারমোনিয়াম, থেমে গেল আয়েশাবাঈয়ের নাচ। সিংদেওজী ছুটে এসে দুলারীকে তুলে ধরলো। কমল কপালে হাত দিয়ে তাপ অনুভব করলো।

"ইশ, জ্বরে যে একেবারে গা পুড়ে যাচ্ছে।"

কমল তাড়াতাড়ি বেরিয়ে চলে গেল ডাক্তার ডেকে আনতে।

বাইরে রাস্তায় তখন জনতার স্লোগান-গর্জন উদ্দাম হয়ে সুদূর বঙ্গোপসাগরের ঢেউ এসে যেন উপচে পড়ছে বৌবাজারের ফুটপাথে।

সিংদেওজী ডাকলো, "দুলারীবাঈ! দুলারী!!"

দুলারী চোখ খুললো। আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কোথায়?"

"এই যে এখানে।"

দুলারী মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখলো।

বাইরের রাস্তায় স্লোগান দিয়ে আরেকটি মিছিল চলে গেল।

"কমল কোথায়?" দুলারী জিজ্ঞেস করলো।

"ডাক্তার আনতে গেছে।"

রাস্তার মোড়ে মুখে লাউডস্পীকার লাগিয়ে এক কর্মী বক্তৃতা দিচ্ছে জনতাকে সম্বোধন করে।

"লছমীপ্রসাদজী কোথায়?" দুলারী আবার জিজ্ঞেস করলো।

কেউ কোনো উত্তর দিতে পারলো না। দুলারীর যেন মনে

হোলো অনেক দূর থেকে লছমীপ্রসাদজীর গান ভেসে আসছে,—
গোরী, তেরে নয়না কাজর বিন কারে ··

রাস্তায় আরেকটি মিছিল চলে গেল স্লোগান দিয়ে। দূর থেকে ভেসে-আসা গান চাপা পড়ে গেল।

তুলারীর মাথা ঢলে পড়লো একপাশে। সিংদেওজী তার হাত তুলে ধরে নাড়ি অনুভব করলো। তারপর আস্তে হাতটা নামিয়ে রাখলো। মাথাটা ঠিক করে দিলো বালিশের উপর। একটি চাদর দিয়ে আস্তে আস্তে ঢেকে দিলো তার শরীর। তারপর জানলার কাছে এসে দাঁড়ালো।

রাস্তা দিয়ে তখন ফ্ল্যাগ, ব্যানার আর পোস্টার হাতে মিছিলের পর মিছিল চলে যাচ্ছে। খুব শোরগোল, হৈ-চৈ। আস্তে আস্তে আরো বেড়ে যাচ্ছে অশান্ত জনতার বিক্ষুব্ধ গর্জন।

গলির মধ্যে একটি গাড়ি এসে ঢুকলো। গাড়ি এসে ঠিক বাড়ির সামনে থামলো। গাড়ি থেকে নামলো কমল, কমলের পেছনে ব্যাগ হাতে স্টেথো-গলায় এক স্যুট-পরা ডাক্তার।

তাদের সামনে দিয়ে কয়েকজন লোক স্লোগান দিতে দিতে চলে গেল বড় রাস্তার উত্তুরঙ্গ মহাসমুদ্রের দিকে। কমল আর ডাক্তার একটু দাঁড়ালো। তারপর রাস্তা থেকে সিঁড়ির ধাপে উঠে এলো।

···সিংদেওজী ঘরের ভিতর ফিরে তাকালো। তুলারীর প্রশান্ত মুখ টাটকা ফুলের মত স্নিগ্ধ, শুভ্র।

আর নিস্তব্ধ ঘর ভরে তখন বেলফুল আর রজনীগন্ধার গন্ধ।

শেষ

এই লেখকের অন্যান্য বই :

কর্ণফুলি

রঙের বিবি

বেগমবাহার লেন

অনুরঞ্জিতা

পূর্বরাগের ইতিহাস

অন্তরতমা

বিশাখার জন্মদিন

চায়না-টাউন

রাজা ও মালিনী

মিতালী-মধুর

নিশীথ-নিঝুম

অনেক সন্ধ্যা, একটি সন্ধ্যাতারা

আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য উপন্যাস

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের
তারার আঁধার

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের
কস্তুরীমৃগ

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
বৈশালীর দিন

বিমল করের
মল্লিকা

আশাপূর্ণা দেবীর
উত্তরলিপি